Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯৫২-১৯৭১

[Political Movement of Bengal Women in West Bengal : 1952-1971]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

রায়হানা শারমিন

রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষাবর্ষ : ৩৫২/২০১২-১৩

পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৩১৫/২০১৩-২০১৪

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন

অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি রায়হানা শারমিন এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য জমাদানকৃত ***পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯৫২-১৯৭১*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে **এম.ফিল.** ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য জমা প্রদান করিনি। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়াবলি বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এই অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, কোন নারী-পুরুষ বা দল-মত কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়নি।

(রায়হানা শারমিন)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষাবর্ষ : ৩৫২/২০১২-১৩
পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৩১৫/২০১৩-২০১৪
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন : পিএবিএক্স ৯৬৬১৯০০-৭৩/৬৪৯০
নং: .....

Department of Political Science
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone: PABX 9661900-73/6490
E-mail: polisci@du.ac.bd
তারিখ: .....

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক রায়হানা শারমিন কর্তৃক **এম.ফিল.** ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯৫২-১৯৭১*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সম্পন্ন হয়েছে। আমি এই অভিসন্দর্ভ পাঠ করেছি। আমি মনে করি এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানামতে এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি।

এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা প্রদানের জন্য গবেষক রায়হানা শারমিনকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

(অধ্যাপক ড.দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
ভূমিকা	১-১০
প্রথম অধ্যায়	**১১-৪৫**
বাঙ্গালী নারী আন্দোলনের গোড়ার কথা	
দ্বিতীয় অধ্যায়	**৪৬-৬৭**
স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ	
তৃতীয় অধ্যায়	**৬৮-৯৪**
ভাষা আন্দোলন ও নারী নেতৃত্ব	
চতুর্থ অধ্যায়	**৯৫-১৩৬**
মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী পারঙ্গমতা	
উপসংহার	**১৩৭-১৪৩**
গ্রন্থপঞ্জি	**১৪৪-১৫২**
পরিশিষ্ট	**১৫৩-১৬৯**

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দেলন : ১৯৫২-১৯৭১*। অশেষ কৃতজ্ঞতা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি, যিনি শত প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়েও আমার কাজটি সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীনের তত্ত্বধানে আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ আমার গবেষণা কাজটি সম্পাদন করতে সহায়তা করেছে। তিনি সর্বদা আমাকে আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও উপদেশ দিয়ে আমার কাজকে গতিশীল রেখেছেন। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বহু ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমাকে সময় দিয়েছেন।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এস.এম মফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক জনাব মো. জাকারিয়া ও গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আব্দুর রাজ্জাক। তাঁদের পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি। গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে যেয়ে আমি যেসকল অভিজ্ঞ লেখক ও গবেষকবৃন্দের লেখালেখি ব্যবহার করেছি তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে করতে যেয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় গ্রন্থাগার, উইমেন ফর উইমেন লাইব্রেরি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, রোকেয়া হল লাইব্রেরি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। উপরিউক্ত লাইব্রেরিসমূহ ছাড়াও এবং আমি বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর থেকেও বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের

Dhaka University Institutional Repository

আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি আর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের, যারা আমাকে নানাভাবে, নানাসময়ে সহয়তা করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার মা ফাতেমা মাসুদ ও বাবা মো. মাসুদুর রহমানের প্রতি, যারা আমাকে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সবসময় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকায় আমার শিশুপুত্র আয়ান মাহ্‌মুদ সমৃদ্ধ অনেক সময় আমার সঙ্গ লাভ করতে পারেনি, তার জন্য আমার অনেক অনেক ভালোবাসা ও আদর।

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন নীলক্ষেত মার্কেটের কাকলী মাল্টিকালার কম্পিউটারের স্বত্বাধিকারী জনাব রহমত উল্লাহ। তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমার সকল গবেষণা-শুভানুধ্যায়ী ও অনুপ্রেরণা দানকারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

(রায়হানা শারমিন)

এম.ফিল. গবেষক

রেজিস্ট্রেশন ও শিক্ষাবর্ষ : ৩৫২/২০১২-১৩

পুনঃ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৩১৫/২০১৩-২০১৪

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১৯৫২ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তু। বর্তমান সময়ে বাঙ্গালী নারীরা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতা ও যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। নারীকে এই অবস্থানে পৌঁছাতে দীর্ঘ সংগ্রামী পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংস্কারায়ণে নারীর ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা ও গবেষণা খুবই অপ্রতুল। ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের সময় বাংলায় শিক্ষা ও আধুনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়। এই শিক্ষা ও চেতনা সমৃদ্ধ মানুষরা এই ধারণায় উপনীত হন যে, দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রয়োজন। এই আধুনিক চেতনা পূর্ণাঙ্গ রূপে বাস্তবায়নের জন্য নারী শিক্ষা ছিল বিশেষ জরুরি বিষয়। কারণ তারা মনে করতেন শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল নারীকে কুসংস্কার ও বৃত্তাবদ্ধ সমাজ থেকে রক্ষা করা সম্ভব। আর এর মাধ্যমেই সে আধুনিক যুগের সুযোগ-সুবিধার সাথে পরিচিত হবে। এ লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। এসকল সমাজ সংস্কারকগণ নারী নিপীড়ন বন্ধে কাজ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভাগলপুর মহিলা সমিতি, বঙ্গীয় মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া নবজাগরণের সময় কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সাহিত্যে নারীর অগ্রগতির প্রযোজনীয়তার কথা বেশ জোরেসোরে আলোচনা করেছেন। লেখকেরা তাদের লেখনীতে নারীদের দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুফিয়া কামাল, শামসুন নাহার, নবাব ফয়জুননেসা তাঁদের লেখনীতে ও বিভিন্ন মাধ্যমে নারীজীবনের বিভিন্ন বিষয় ফুটিয়ে তুলেছেন। শিক্ষার অগ্রগতি ও জাতীয় চেতনাবোধের উন্মেষের কারণে বাংলায় এসময় থেকে নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার তরান্বিত হতে থাকে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ সংগঠিত হলে স্বদেশী চেতনার সূত্রপাত হয়। এই সময় সরলাদেবী 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে দেশবাসীকে সচেতন করতে থাকেন। ১৯২১ সালে আশালতা সেনের উদ্যোগে গেণ্ডারিয়া 'শিল্পাশ্রম' এবং ১৯২৪ সালে তারই উদ্যোগে 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি' গড়ে ওঠে। এর সঙ্গে সরযুবালাগুপ্ত ও সুরমাগুপ্ত জড়িত ছিলেন। এভাবে নারী সমাজের মধ্যে সচেতনতা, অধিকারবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন বিপ্লবী নারী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত। প্রীতিলতা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মহুতি

Dhaka University Institutional Repository

দেন। এদেশের আরেক উল্লেখযোগ্য নারী কমরেড ছিলেন ইলা মিত্র। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের মহান নেত্রী তিনি। নিপীড়িত শোষিত কৃষক জনগোষ্ঠীর পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের জন্য সকল ত্যাগ স্বীকার করে, জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেছেন। তেভাগা আন্দোলন, টংক আন্দোলন, নানকর আন্দোলন, নাচোলের কৃষক আন্দোলনের সাথে নারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল।

মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। জন্ম নেয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান আবার দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি পশ্চিম পাকিস্তান, অপরটি পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে হাজার মাইলের ব্যবধান, দুই অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাপন, শিক্ষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থায় ব্যাপক পার্থক্য ছিল। শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির মিল দেখিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান এক থাকার স্বপ্ন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। দিন দিন পার্থক্য ও বৈষম্য বাড়তে থাকায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলা ভাষার ওপর আক্রমণ করায় ফুঁসে ওঠে বাংলার ছাত্র-জনতা। ভাষার জন্য ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত এদেশের ছাত্র-জনতা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীর ওপর নানারকম অত্যাচার, নির্যাতন চলে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে ছাত্রীরাও তাতে যোগ দেন। ছাত্রীদের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন সুফিয়া আহমদ, শাফিয়া খাতুন, শামসুর নাহার, ফরিদা বারী মালিক, জহুরত আরা, খালেদা ফেন্সি প্রমুখ। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানে বের হলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ছাড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার স্কুল-কলেজের অসংখ্য ছাত্রীরা ছাত্রদের সাথে মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সেসব ছাত্রীদের অনেকেই পুলিশি নির্যাতনের শিকার হন। এ ঘটনার পরবর্তী দিন আনোয়ারা খাতুন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে পুলিশি নির্যাতনের বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন যে- এ অত্যাচারের বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। দু-একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করবো। মিলিটারী মেয়েদের গাড়িতে করে কুর্মিটোলায় নিয়ে গিয়েছে। পুলিশের লাঠি চার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে।

১৯৫৩ সাল থেকে ভাষা দিবস, রাজবন্দিদের মুক্তি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন এজেন্ডায় এদেশের নারীসমাজ আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে নারী নেত্রীবৃন্দ যুক্তফ্রন্টের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিল। এসময় নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে একটা আইন সংশোধন

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় যে, 'কোন মহিলা যে কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন, তাঁকে সেই স্থানে ভোট দিতে হতে হবে'। নারী নেত্রীবৃন্দ এ আইনটির অসারতা নিয়ে বিরোধিতা করেন।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন- নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন ও বদরুন্নেসা খাতুন। আর নেলীসেনগুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁদের সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় ও আত্মবিশ্বাস জন্মে। ১৯৫৫ সালে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের নারীরা সর্বপ্রথম মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাস্তায় ঘেরাও করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন চালু হলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এসময় নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা বন্ধ থাকে। ১৯৫৯ সালে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হলে ১৯৬০ গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি, শিশুরক্ষা সমিতি, আপওয়া কল্যাণ পরিষদ, ইসলামিক মহিলা মিশনসহ অন্যান্য মহিলা সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসকল সভা ও সম্মেলন নারীর চাকুরীর সুযোগ বৃদ্ধি, পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা, নার্সিং বৃত্তি প্রসার, নারী শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

১৯৬১ সালে নারী আন্দোলনের ফলে ' মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১' প্রণীত হয়। এটি বাঙ্গালী মুসলিম নারী সমাজের অধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এতে বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে তালাক দেয়া নিয়ন্ত্রণ করা, বিয়েতে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ এবং ছেলেদের বয়স ২১ বছর নির্ধারণ করা, মোহরানা পরিশোধ করা এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদে ৬টি আসন এবং প্রত্যেক প্রদেশে ৬ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। ১৯৬৪ সালে শামসুন নাহার মাহমুদ নির্বাচক মণ্ডলীর বিলের সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের বেগম রোকাইয়া আনোয়ার আইন পরিষদসহ নির্বাচক মণ্ডলীতে ২৫% আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবি জানান। নারী নেতৃবৃন্দের দাবির প্রেক্ষিতে নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের নাম *রোকেয়া হল* করা হয়।

এছাড়া ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট পদে অংশগ্রহণ করলে নারী সমাজের জন্য পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পারিবারিক

Dhaka University Institutional Repository

আইন প্রনয়ণ ও ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারে নারীরা ব্যাপকভাবে যুক্ত হওয়ায় নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। নারীরা এসকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে যেয়ে নানা রকম বাঁধার সম্মুখীন হন। উল্লেখ্য যে, সুফিয়া কামালের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁর স্বামীর প্রমোশন পাকিস্তান সরকার আটকে রেখেছিল।

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ২২ জানুয়ারির মিছিলে ৫০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ৫০০ জন ছাত্রী ছিল। মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। সুফিয়া কামাল নিজের বাসায় নারী নেত্রীদের ডেকে এনে সভা করেন। সভায় উপস্থিত সকলে আন্দোলন চালিয়ে যাবার ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রী ছাত্র-জনতার উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিবৃতি দেন। চট্টগ্রামের ছাত্রীরা ২৮ জানুয়ারিতে খালেদা খানমের সভাপতিত্বে সভা করেন। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আনুমানিক আড়াই হাজার নারী শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে ঢাকা শহরে মিছিল শুরু করেন। মিছিলটি ঢাকার সকল রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে নারী নেতৃত্ব বিকাশের জন্য এসময় 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এ সংগঠনের আহবায়ক ছিলেন মালেকা বেগম। এসময় থেকে বিপুল সংখ্যক নারী, রাজনৈতিক নেত্রীবৃন্দ ও ছাত্রীরা ২১ ফেব্রুয়ারিতে শহীদ দিবস পালন করতেন ও প্রভাতফেরীতে যোগ দিতেন। মোটকথা ঊনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে নারী নেত্রীবৃন্দ তাদের দাবি আদায়ে তৎপর ছিলেন। এই গণজোয়ারে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৭০ সালে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত *পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ* এর মাধ্যমে রাজবন্দিদের মুক্তি, গণভোটে সরাসরি নির্বাচন, নারী শ্রমিকদের মজুরিগত বৈষম্য দূর করা, নারী নির্যাতন বন্ধ প্রভৃতি দাবি আদায়ে নারীরা সোচ্চার হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের ৭ জন নারী সদস্য সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচিত হন। তাঁরা হচ্ছেন বদরুন্নেছা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, তাসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আক্তার ডলি ও মমতাজ বেগম ।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ জয়ী হলেও ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে পাকিস্তান সরকার টালবাহানা শুরু করে। এমতপরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালে সকল শাসন-শোষণ অবসানের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ

Dhaka University Institutional Repository

মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি স্বরূপ ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেখানে বহু পুরুষের পাশাপাশি অসংখ্য নারী উপস্থিত ছিলেন। তাদের কারোর হাতে বাঁশের লাঠি, তীর-ধনুক ছিল। যেন যুদ্ধ আসন্ন। ৭ মার্চের পর সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী তাঁর বাড়িতে যুদ্ধের জন্য মেয়েদের রাইফেল চালানোর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ২৩ মার্চ নারীদের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুকে 'গার্ড অব অনার' প্রদান করা হয়।

এসময় দেশের জেলায় জেলায় নারীদের সংগঠিত করে সামরিক কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। যেমন - ধানমণ্ডি, জিগাতলা, রায়ের বাজার, কলাবাগান প্রভৃতি এলাকায়। ৮ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে কালো পতাকা তোলার সফল কর্মসূচি পালনে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। নবীন, প্রবীণ সব বয়সের নারীই দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য তখন মরিয়া হয়ে ওঠে। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বহু জেলায় নারীরা ঝটিকা সফর করেন। বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বর্বরোচিত আক্রমণ চালায় যা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছে। সেদিন থেকে নারীরা যার যার অবস্থান থেকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। কেউ অস্ত্র হাতে, কেউ সহযোদ্ধাদের খাবারের ব্যবস্থা করে, কেউ মেডিক্যাল প্রশিক্ষণ নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষার ব্যবস্থা করেন। এসময় বাংলার নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাদের পাশবর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সর্বোপরি দেশমাতৃকতার জন্য নিবেদিত প্রাণ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সবসময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন নারী মুক্তিযোদ্ধারা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা আমাদের প্রায় ৪ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানী ঘটায়। এসকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাই সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী বলেন যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বধানে পশ্চিমবঙ্গের পার্ক সাকার্সের গোবরা এলাকায় তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। বহু সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমিতে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলার নারীসমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁরা এসকল লড়াই-

Dhaka University Institutional Repository

সংগ্রামে কখনো সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, আবার কখনও সহযোদ্ধা হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন। এসকল রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে নারীর ভূমিকা নিয়ে বৃহৎ পরিসরে গবেষণাকর্ম সম্পাদন করার জন্য আমি 'পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯৫২-১৯৭১' শীর্ষক বিষয়টিকে এম. ফিল. অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য নির্বাচন করেছি।

গবেষণার বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব

পূর্ব বাংলার নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হলেও, পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে গবেষণা একেবারে অপ্রতুল। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিসর অনেক বিস্তৃত। আমার গবেষণার মূল বিষয় হচ্ছে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত নারীদের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে এদেশে একটি নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হয়। নতুন সরকার এদেশবাসীর চিন্তা-চেতনা, সংস্কৃতি কোন কিছু মাথায় না রেখে একগুঁয়েমি করে এদেশে অপ্রচলিত একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ভাষার মধ্যেই মূলত মানুষের চিন্তা-ভাবনা, স্বপ্ন আবর্তিত হয়। সেই ভাষার ওপর আঘাত আসায় এদেশে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তাতে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজও এগিয়ে আসে। ১৯৬১ সালে নারীদের দাবির মুখে পারিবারিক আইনের সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বাড়ায় নারীরা রাস্তায় নেমে সক্রিয় আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় তারা ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে রাজপথে দাবি আদায়ে নেমেছেন। ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে ৭ জন নারী প্রার্থী অংশগ্রহণ করে ও জয়লাভ করেছেন। সর্বোপরি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাভাবে অংশগ্রহণ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সফলতাকে তরান্বিত করেছেন।

উপরিউক্ত এইসব আন্দোলন-সংগ্রামের ব্যবহারিক প্রয়োগ কিভাবে নারীদেরকে রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় করেছিল, এই প্রসঙ্গটিকে এ গবেষণার অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবিক এ বিষয়টি জাতীয় ও বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। পূর্ববঙ্গের অনগ্রসর সমাজ কাঠামোর কঠোর প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আসা নারীরা দায়িত্বশীলতার সাথে রাজনৈতিক কর্ম সম্পাদন করেছেন, নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, বিভিন্ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত থেকেছেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করেছেন। এসবের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আরো কার্যকারী

Dhaka University Institutional Repository

ও ফলপ্রসূ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরেই নারীদের উন্নয়নের যাত্রা শুরু হয়। এজন্য বলা হয় যে নারীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বহমান থাকলে সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

ইংরেজ শাসনামলে নারীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে খুব একটা সক্রিয় ছিলেন না। পাকিস্তান আমলে ধীরে ধীরে তারা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। এসময় কয়েকজন নারী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বেশকিছু কাজ করেন। পূর্ব বাংলার নারী সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পূর্ব বাংলায় নারী শিক্ষার অগ্রগতির সাথে সাথে নারীরা কুসংস্কার ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি লাভ করতে থাকে। নিজেদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। ধীরে ধীরে নারীর রাজনৈতিক চিন্তা- চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়। এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। আমার গবেষণার উদ্দেশ্যাবলির একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. পূর্ব বাংলার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও নারী শিক্ষা বিষয়ে অনুধাবন করা।
২. নারীদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিশ্লেষণ করা।
৩. পূর্ব বাংলার নারী সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট ও কার্যপরিধি মূল্যায়ন করা।
৪. পূর্ব বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অবস্থান, তাদের দাবি-দাওয়া ও অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করা।
৫. পূর্ব বাংলার নারীদের নেতৃত্বে গঠিত বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলির গুরুত্ব নির্ণয় করা।
৬. ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর বিশেষ অবদান মূল্যায়ন করা।
৭. নারীদের রাজনৈতিক সফলতা বা ক্ষমতায় পর্যালোচনা করা এবং সমাজ ও দেশের সামগ্রিক কল্যাণে তাদের অবদান চিহ্নিত করা।

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রধান দিক পরিবর্তনকারী ঘটনা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। এ আন্দোলনের সফলতার পর পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা তৈরি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে আমরা স্বাধীনতা লাভ করি। এটি বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় অর্জন। এজন্য আমি আমার গবেষণাকর্মের পরিধি ১৯৫২-১৯৭১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছি।

গবেষণা পদ্ধতি

এই এম.ফিল. গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যেয়ে আমি সম-সাময়িককালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, সংশ্লিষ্ট তথ্য কেন্দ্র, দৈনিক সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি। আর এসকল প্রাথমিক উৎস অবলম্বন করে যারা পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, তাঁদের লেখা-লেখিগুলো আমি দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের কয়েকজন বিদগ্ধ শিক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে অনেকবার আলাপ-আলোচনা করেছি। এছাড়া বাংলাদেশের কয়েকজন প্রথিতযশা নারী নেত্রী ও নারী লেখকদের সঙ্গে কয়েকবার অনানুষ্ঠানিক আলাপচারিতা করেছি।

অধ্যায় পরিকল্পনা

'পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন : ১৯৫২-১৯৭১' শীর্ষক গবেষণাকর্মটি চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়গুলোর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পূর্ববাংলার নারী আন্দোলনের গোড়ার কথা। এই অধ্যায়ে ভারতসহ বর্হিবিশ্বের নারীরা কষ্টসংকুল পথ অতিক্রম করে কিভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছেন, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন তা বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের নারীরা অজ্ঞতা, অশিক্ষা, সহমরণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহে পরিবেষ্টিত থেকে যে অসহনীয় অবস্থায় জীবনযাপন করতেন সে বিষয়ে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল সেটির বিষয়বস্তুও এ অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। নারীরা বছরের পর বছর ভোটাধিকার আদায়ের জন্য যে চেষ্টা চালিয়েছেন এবং অবশেষে ভোটাধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছেন তাও এ অধ্যায়ের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেশভাগ হওয়ার পর, নতুন ভূখণ্ডে নারী-পুরুষ এক সাথে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করলেও নারীরা যে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল সেগুলোর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে নারীরা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য বেশকিছু সংগঠন গড়ে তোলেন, সরকার প্রথমদিকে এসকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করলেও পরবর্তীতে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে, এসকল বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষের অসহনীয় দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে নারীরা তৎকালীন সরকারের মন্ত্রীকে রাস্তায় অবরোধ করে রাখেন সে বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। দেশভাগের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকলে গভর্নরের সাথে সাক্ষাত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ না করার জন্য নারীরা যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন তাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। বেগম পত্রিকা প্রকাশ, বেগম ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় নারীরা যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সে বিষয়গুলোও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের নারীপ্রার্থী হিসেবে যারা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও নারীরা কিভাবে সি.এস.এস অফিসার নিয়োগের সুযোগ পেলেন সে ইতিহাসও এ অধ্যায়ে বিধৃত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, বিস্তৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এ আন্দোলনে নারী-পুরুষ উভয়ে অংশগ্রহণ করলেও নারীরা বিশেষ কি প্রভাব রেখেছিলেন, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মহানগর থেকে জেলা, জেলা থেকে উপজেলা, গ্রাম সর্বত্র এ আন্দোলনে নারীরা নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে কিভাবে সামনে এগিয়ে গিয়েছে সেগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে। নারী রাজনৈতিক নেত্রী ও কর্মীদের উপর পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে সে সকল বিষয়ে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে অনেক নারী সামাজিক নিগ্রহের স্বীকার হয়েছিলেন, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে একজন শিক্ষিকাকে ডির্ভোস প্রদান করা হয়েছিল তাও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এতে নারীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন হন। এই আন্দোলনে নারী সমাজের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও তাদের মতামত এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নারীরা কিভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হয়ে নারী সদস্যেদের অংশগ্রহণ, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ, ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ব্যাপক সংখ্যক নারীদের উপস্থিতি এসব নিয়ে এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নারীরা পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

পাশাপাশি কিভাবে দেশে-বিদেশে (ভারত) মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, গোরিলা যুদ্ধ করেছেন, অস্ত্রহাতে সম্মুখ যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধাহতদের সেবা-শুশ্রুষা করেছেন এসকল বিষয়ে এ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের সময় নারী নির্যাতনের যে ভয়ালচিত্র ফুটে উঠেছে সে বিষয়টির প্রতিও এ অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপরিউক্ত অধ্যায়গুলোতে আলোচিত বিষয়সমূহের মূলকথা উপসংহারে উপস্থাপন করা হয়েছে। এরপর ১৭টি পরিশিষ্ট সন্নিবেশিত করেছি। সর্বশেষ এ গবেষণাকর্মে ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য উৎসের তালিকা সংযোগ করা হয়েছে।

আমি আশা করি আমার এ অভিসন্দর্ভটি পাঠ করে ১৯৫২-১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের বিষয়ে পাঠকগণ করলে অতি সহজেই একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবেন। পাশাপাশি নারীদের বিভিন্ন বিষয়াবলি নিয়ে অনেকেই গবেষণায় আগ্রহী হবেন।

আমি এই গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে যেয়ে পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের বহু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। আমার গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যসূত্রের মধ্যে সেসকল বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমার গবেষণাকর্মের কাঠামোটি চারটি বিশেষ অধ্যায়ে বিভক্ত হওয়ায় আমি সকল তথ্যের সংযোজন করতে পারেনি, এটি আমার গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতা। যারা ভবিষ্যতে এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করবেন, তারা এসকল তথ্য-উপাত্তের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বাঙ্গালী নারী আন্দোলনের গোড়ার কথা

আধুনিক যুগের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে মানুষের চিন্তাধারা, জীবনবোধ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। যা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এর পূর্বে বর্ণভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা ও লৌকিক ধর্মাচারের নামে নারী নির্যাতন সমাজকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এ অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্তি দেয়ার জন্য সমাজ সংস্কারকগণ নানান কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীদেরকে উজ্জীবিত করতে থাকেন। এই পরিমণ্ডলে তখন পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এসময় তাদের চিন্তা-চেতনায় নারীর বিভিন্ন অধিকার প্রাপ্তির বিষয়টি নতুন করে জায়গা করে নেয়। নারীরা শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে অন্দরমহল ছেঁড়ে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের জন্য সমিতি ও সংগঠন গড়ে তোলেন। এসময় বর্হিঃবিশ্বের নারীদের অবস্থাও ভালো ছিল না। শিল্প বিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্যের নারীরা সর্বপ্রথম শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ পায়। নতুন শাসক, শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে তখন প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠতে থাকে। ফলে নারীরাও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে থাকেন। তারাও নিজেদের অধিকার আদায় এবং এই দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। বাংলার নারীও সমাজও এতে অনুপ্রাণিত হয়। তাদের অধিকার, উন্নয়ন, প্রগতির দাবি উত্থাপনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের যাত্রা হয়। পুরুষসমাজও নারীদের এই দুরাবস্থা অনুধাবন করে তাদের শিক্ষার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নারীরা নিজেদের অবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। এসময় নারীদের মধ্যে সংস্কার ও ঔপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তির চেতনা জন্ম নেয়। তারা শিক্ষা, ভোটাধিকার, স্বাধিকারসহ সকল বিষয়ে অধিকারমুখী হতে থাকেন। এই আন্দোলনের সূচনা মূলত দুটি ধারায় বিকশিত হয়। যথা- (ক) সংস্কারমূলক ধারা এবং (খ) উপনিবেশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারা। নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেরণাই নারীদের মাঝে অধিকার-দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে ও আত্মসচেতনতার জন্ম দেয়। এরপর ক্রমান্বয়ে নারী সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। আমার গবেষণাকর্মের পটভূমি হিসেবে আলোচ্য অধ্যায়ে বাঙ্গালী নারী আন্দোলনের গোড়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে পাশ্চাত্যের অধিকার বঞ্চিত নারীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর উনবিংশ শতকে বাংলার নারীরা কিভাবে কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে এসেছে এবং আধুনিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক বিকাশের দিকে যাত্রা করেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্যে নারীর অবস্থা

পাশ্চাত্যের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের নারীদের অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। সমাজে স্বামীর কর্তৃত্ব থাকায় - স্ত্রীর সম্পত্তি, অলংঙ্কার, অভিভাবকত্বে ছিল স্বামীর আধিপত্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধা থাকলেও নারীরা সমানাধিকারের কথা ভাবতে পারেনি। ১৮৬৫ সালের আগে তারা ভোটাধিকার বা রাজনৈতিক অধিকারের কথা চিন্তা করতে পারেনি। পাশ্চাত্যের নারীরা ১৮৭০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়। ১৮৭৮ সালে স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রী ভর্তি হয় এবং ১৮৮২ সালে ছাত্র ও ছাত্রীদের সমমর্যাদা নিশ্চিত হয়। ১৮৭০ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েরা পরীক্ষায় বসলেও হাজিরা খাতায় তাদের নাম থাকতো না। ১৮৭০ সালে বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক বিল পার্লামেন্টে প্রথম উপস্থাপন করা হয় এবং বিলটি আইনে পরিণত হতে সময় লাগে আরো ১৮ বছর। পুরুষের ন্যায় ভোটাধিকার অর্জনের দাবিতে মার্কিন মহিলারা আন্দোলন করেন। তাদের শাসনতন্ত্রে ঊনবিংশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯২০ সালে ভোটাধিকার লাভ করেন। ইংল্যান্ডে নারী-পুরুষের সমান ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সাল থেকে।[১] নারীদের শিক্ষার বিষয়ে ফ্রান্স ও জার্মানির গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল না। গৃহশিক্ষাই ছিল নারী শিক্ষার একমাত্র উপায়। এজন্য তারা উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারেনি। ১৮৮৩ সালে প্রাশিয়ায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অবস্থা বিরাজ করছিল। মেয়েরা ১৯০৮ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায়।

ভৌগোলিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব, রেঁনেসা, বাণিজ্যের প্রসার, বিপ্লব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদির প্রভাবে সমাজ জীবনে বহু পরিবর্তন আসে। মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো বিকশিত হতে থাকে। যুক্তিবাদের ওপর মানুষের আস্থা তৈরি হতে থাকে, মানুষের মধ্যে অধিকার ও সচেতনতাবোধ জাগতে থাকে। সমাজের এই বিভিন্ন ভাবনাগুলোর মধ্যে নারীমুক্তির বিষয়ে চিন্তাধারা শুরু হয়। এই চিন্তা-ভাবনাগুলো প্রচার করতে থাকেন মেরি ওলস্টোনক্রাফট, ক্যারেলাইন নর্টন, উইলিয়াম থম্পসন, জে.এস. মিল প্রমুখ। নারীমুক্তি ধারণা সচেতন প্রথম নারী প্রবক্তা ছিলেন ক্রিস্টিন ডিপিসাঁ। এছাড়া ১৭৯২ সালে মেরি ওলস্টোনক্রাফট তাঁর *Vindication of the Rights of Women* নামক গ্রন্থে নারীর পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর গ্রন্থটি ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হয়।[২] নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) নারী অধিকার বিষয়ে বিমূর্ত ধারণা প্রকাশ করলে মেরি ওলস্টোনক্রাফট তাঁর গ্রন্থে নারী স্বাধীনতায় নতুন মাত্রা যোগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের কারণে নারীমুক্তি আন্দোলন জোরালো হতে থাকে। ' সব দেশের সব মানুষ জন্মগতভাবে সম্মান এবং মানবাধিকারগুলো একই রকম'- এই মূল্যবান ধারণা থেকেই নারী-পুরুষের মনে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। ঐ বছরের ৪ থেকে ৬ অক্টোবরের মধ্যে কতিপয় উৎসাহী বিপ্লবীর চেষ্টায় প্যারিস থেকে ভার্সাই পর্যন্ত *March of Women* অনুষ্ঠিত হয়। এই ঐতিহাসিক মিছিলটি নারীর অধিকার আদায়ের বিষয়ে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।[৩] এই নারী মিছিলের প্রভাব ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী নারীদের মাঝেও বিরাজ করতো। ১৭৯৩ সালে যখন ফ্রান্সে *Charter of Human Rights* প্রস্তুত করা হয় তখন মহিলারা ঘোষণা করেন, "If the women have the right to go to the gallows, why can't they have the right to go the parliament?"[৪] ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী জাগরণের আওয়াজ চারিদিকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০ সালে ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনে নারী শিক্ষা ও অধিকারের বিষয়টি উত্থাপিত হয়। ১৮৫১ সালে মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলনের জন্য গঠিত *Sheffield Association* এর উদ্বোধনী সভায় মহিলাদের ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং এতে নারীদের সোচ্চার হবার কথা বলা হয়। ১৮৬৯ সালে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *The Subjection of Women* এ যুক্তিশীলতার সঙ্গে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের দাবি উত্থাপন করেন।

১৮৭১ সালে ঐতিহাসিক প্যারি কমিউন বিভিন্ন স্তরের শ্রমজীবী নারীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে অনেক নারী শহীদ হন। কার্ল মার্কস তাঁর *The Civil War in France* গ্রন্থে প্যারিসের মহিলাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। টমাস পেইনের *The Rights of Man* গ্রন্থে নারীজাতির অধিকার সম্পর্কিত বিষয়টি স্থান পায়। মেরি গুডইউনের বিখ্যাত প্রকাশনা *Thoughts on the Education of daughter এবং Uindication of the Rights of Women* এ ইংল্যান্ডের নারীদের সামাজিক দুরবস্থার কথা বর্ণিত হয় এবং তাদের অধিকারের সপক্ষে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরা হয়। মেরি গুডউইনের তিন দশক পর মিসেস থম্পসন নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে জোরালো বক্তব্য উত্থাপন করেন, "Women of England; Women of whatever country ye breathe degraded Awake"[৫]

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস *The Origin of Family, Private Property and the State* গ্রন্থে নারীদের অধিকারের কথা বলেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন যে, আদিম সমাজে মেয়েদের প্রভুত্ব বা

Dhaka University Institutional Repository

সমানাধিকার ছিল। এরপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব এবং পুঁজিবাদের উত্থানের ফলে মাতৃতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং বিশ্বব্যাপী নারী নিগ্রহণ শুরু হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, উৎপাদন যন্ত্রের সমাজতন্ত্রীকরণ এবং সকলের জীবিকার ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব। আগস্ট বেবেল *Woman and Socialism(1879)* এবং *Woman in the Past, Present and Future* গ্রন্থে নারীর পরাধীনতার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। কাল মার্কসের মেয়ে লারা লাফারগে এবং মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ১৮৮২ সালে নারীর অধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু করেন।

বিংশ শতাব্দী হচ্ছে নারী অধিকারের স্বর্ণযুগ। এসময় ভোটাধিকার আন্দোলন জোরদার হাতে থাকে। ইংল্যান্ডে সারা ও এমিলি প্যাংকহার্স্টের নেতৃত্ব নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডে এক বৃহৎ গণমিছিল হয়। প্যাংকহার্স্টের আন্দোলনের ফলে ১৯১৮ সালে ত্রিশোর্ধ্ব মহিলারা এবং ১৯২৮ সালে সব প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা ভোটাধিকার লাভ করেন। নির্বাচনে আমেরিকার মেয়েরাও তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করেন। এদিকে মননশীল যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের মাধ্যমে ১৯২৯ সালে ভার্জিনিয়া উলফ প্রমাণ করেন যে, "নারী প্রতিভা বিকাশের অন্তরায়ের কারণ নিহিত আছে সমাজের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বের নারীবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক মতাদর্শ প্রচারিত হয়। এর সূত্রপাত ঘটান সিমোন দ্য বোভেয়া তাঁর অসামান্য গ্রন্থ *The Second Sex (1949)* রচনার মাধ্যমে। বেটি ফ্রিডানের *The Feminist Mystique (1963)* জার্মেইন গ্রিয়ারের *The Female Eunuch (1970)* কেটি মলেটের *Sexual Politics(1970)* জুলিয়েট মিচেলের *Yeoman's Estate* ইত্যাদি গ্রন্থের মাধ্যমে নারীবাদী দর্শন এক অসাধারণ মাত্রা লাভ করে।"[৬]

ভারত ও বাংলার নারী সমাজের অবস্থা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে ইউরোপের, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের বহু খ্যাতনামা মহিলা এদেশে আসেন এবং নারীমুক্তির আদর্শ প্রচার করেন। এছাড়া পাশ্চাত্য রেনেসাঁস প্রসূত যুক্তিবাদী, মানবতাবাদ, শিক্ষামূলক এবং উদারনৈতিক মতবাদ এদেশের নারীমুক্তি ভাবনায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এসবের মধ্যে দিয়ে এদেশের নারীরা এগিয়ে আসতে থাকে। এ সর্ম্পকে O' Malley লিখেছেন : The impact of the west on Indian civilization has brought about changes that are more fundamental in the case of women than men. To men it bought new conception of the world, of its material resources, ethical standards, and political possibilities, but to

Dhaka University Institutional Repository

women it brought slowly but potentially a new conception of themselves. If men reassessed themselves as citizens in a new India, women revealed themselves as human beings in new social order."[৭] অর্থাৎ বৈদিক যুগে মোটামুটি ভালোই ছিল নারীর অবস্থান। এ সম্পর্কে ড. সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বৈদিক যুগে সার্বিকভাবে নারীর অবস্থা সন্তোষজনক ছিল। এ যুগে নারী শিক্ষার ব্যাপারে সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল। নারীর বেদ অধ্যয়নের অধিকার ছিল, তারা উপনয়নের অধিকারী ছিলেন। এসময়ে নারীর উচ্চশিক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় ঋকবেদে। ঋকবেদে কুড়িজন নারীর রচিত সুক্ত পাওয়া যায় যাদেরকে ঋষি বলা হয়েছে।"[৮]

বৈদিক যুগের সূচনা পর্বে নারীরা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করতো। পতঞ্জলি বা কাত্যায়নের মতো প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণের লেখা থেকে জানা যায় যে, আদি বৈদিক যুগে নারীরা শিক্ষিত ছিলেন। ঋকবেদের শ্লোক থেকে জানা যায় যে, নারীরা পরিণত বয়সে বিয়ে করতেন এবং সম্ভবত স্বয়ংম্বরা নামক প্রথার মাধ্যমে নিজের স্বামী নির্বাচন করতে পারতেন। ঋকবেদ, উপনিষদের মতো আদি গ্রন্থসমূহে ভবিষ্যতদ্রষ্টা নারী হিসেবে গার্গী ও মৈত্রেয়ী উল্লেখযোগ্য নাম। নারীদের বেদপাঠের অধিকার ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ শতকে নারীদের অবস্থার অবনতি শুরু হয়। বাল্যবিবাহ প্রথা খুব সম্ভবত ছয় শতকের কাছাকাছি সময় থেকে প্রচলিত হয়।

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রেও নারীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, মনু স্মৃতি অনুযায়ী : নারী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্রের অভিভাবকত্বে থাকবে, একজন মহিলা স্বয়ংশাসিত থাকার উপযুক্ত নয়। নারীদের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করা, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস গ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের কিছু রাজ্যে 'নগরবধূ ' প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীরা নগরবধূ শিরোপা জয় করতে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতো। হর্ষবর্ধনের সময় (সপ্তম শতকে) সতীদাহ প্রথার প্রচলন হয়। তবে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ উচ্চবর্ণের নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরে তাদের জন্য বেদপাঠ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সমাজে পতিতারা শিক্ষিত ও স্বাধীন ছিল। তবে বৌদ্ধ ও জৈন পরিবারে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ ছিল। সাহিত্যে অবশ্য নারীকে প্রেমিকা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে এসময় লীলাবতী ও খনার মতো বিদূষী মহিলারও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে নারীদের স্বাধীনতা না থাকলেও তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হতো। স্বামীদের স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সব দায়িত্ব পালন করতে হতো। তাদের মারধোর ছিল নিন্দনীয়। যেসব পুরুষ তাদের স্ত্রীদের মারধোর করে ঈশ্বর তাদের পূজা নেন না- এই কথা প্রচারিত ছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

বেদ-পরবর্তী যুগে নারীর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। কৌটিল্যের *অর্থশস্ত্র* কালিদাসের বিভিন্ন নাটক, বানভট্টের *হর্ষচরিত্র* হর্ষবর্ধনের নাটক *রত্নাবলী* মাঘ এর *শিশুপালবধ* কহলনের *রাজতরঙ্গিনী* প্রভৃতি গ্রন্থে নারীর দুরবস্থার কথা জানা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর পরিচয় শুধু পুত্রের মাতা হিসেবে। আর কোন স্বাধীনতা ছিল না। বিধবা বিবাহ উঠে যায় এবং বিধবারা বাকি জীবন শোক ও কৃচ্ছ্রসাধনার মধ্যে দিতে অতিবাহিত করেন। বৈদিকযুগে নারীর স্থান খুব উচুঁতে থাকায় শিক্ষার দিকে নজর দেয়া হতো। ঘোষ, অপালা, বিশ্ববারার মতো নারীরা বৈদিক শ্লোক রচনা করেছেন। উপনিষদে গার্গীর মতো দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে বির্তকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উচ্চবর্ণের মহিলারা তাদের স্বামীর সাথে যাগযজ্ঞে অংশ নিতেন। তাঁরা সম্পত্তির অধিকারিণীও ছিলেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ইচ্ছা করলে পুনর্বিবাহ করতে পারতেন। কিন্তু বৈদিক যুগের পরবর্তীতে নারীর অবস্থা ভাল ছিল না। ক্রমে সমাজে শুদ্র নারীদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে।

নারী অর্থ 'ভার্ষা' অর্থাৎ ভরনীয়া বা যাকে ভরণ করতে হয়। তবে স্বাধীনতা বলে কিছু ছিল না। পুরুষের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা থাকলেও নারীদেরকে স্বামীর প্রতি অনুগত থাকতে হত। ঋগবেদে নারীদের বহু বিবাহের কথা বলা আছে। তখন ঋকবেদে নারীরা গৃহে আবদ্ধ থাকত না। এমনকি মুদগলিনী, বিশপলা, শশিয়সী প্রমুখ নারীরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে নারীরা গৃহে অবস্থান করতে থাকেন। শুধু সন্তান জন্ম দেয়া তার কাজ বলে পরিগনিত হয়। তবে কন্যাসন্তান হলে স্বামী তাকে ত্যাগ করতে পারত। নারীর যৌন অপরাধের কোন ক্ষমা ছিল না। কালক্রমে(খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০অব্দ-১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে) নারীর এই অবস্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। উপনয়নের অধিকারসহ অন্যান্য অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করা হয়। ঐতিহাসিকরা নারীর অবদমনের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের যুগকে। এর কারণ হিসেবে তারা প্রথমত যে বিষয়টিকে দেখিয়েছেন তা হচ্ছে, সম্ভ্রান্ত পুরুষ কর্তৃক নারী বিবাহ।[৯]

এর পরবর্তী সময়কালে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। বাল্যবিবাহের প্রচলন এবং বিধবাদের পুনর্বিবাহের নিষেধাজ্ঞা ভারতের কিছু সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনের অংশ হয়ে ওঠে। ভারত উপমহাদেশে মুসলমান শাসকদের আধিপত্য বিস্তারের সাথে সাথে ভারতীয় সমাজে পর্দা প্রথার প্রচলন ঘটে। ভারতের কিছু অংশে দেবদাসীরা কখনো কখনো যৌন নির্যাতনের স্বীকার হতেন। রাজনৈতিক কারণে হিন্দু ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মাঝে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এসময় অনেক মুসলিম পরিবারে নারীর গতিবিধি বাড়ির অন্দর মহলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থেই মহিলাদের কাজকর্মকে, গ্রন্থের মূল উপজীব্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে ১৭৩০ সালে তাঞ্জৌরের জনৈক রাজকর্মচারী এম্বকোয়জ্যন রচিত *স্ত্রী ধর্ম পদ্ধতি* একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ সময়কালে রাজনীতি, সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্মসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু নারীর অবদানের বিষয়ে সন্ধান পাওয়া যায়। রাজিয়া (১২০৫ - ১২২০) একমাত্র মহিলা সুলতান যিনি দিল্লি শাসন করেছেন। ১৫৬৪ সালে আকবরের সেনাপতি আসাফ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ হারানোর আগে গোন্দা রানী দুর্গাবতী ১৫ বছর (১৫২৪- ১৫৬৪) রাজ্য শাসন করেছেন। চাঁদবিবি ১৫৯০ সালে আকবরের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আহমেদ নগর রক্ষা করেছেন। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান রাজ্য শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া তারাবাই ছিলেন মহিলা মারাঠা শাসক, যিনি দক্ষিণ ভারতে গ্রাম, শহর ও বিভাগ পরিচালনা করেছেন।[১০]

ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন-শোষণের তাণ্ডবলীলায় ভারতীয় সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে যায়। তাদের সহযোগী নব্য বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটলেও স্বদেশের উন্নয়ন করা এদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল না। এই ভাঙগা-গড়ার মধ্যে নতুন এক শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম হয়। ব্রিটিশরা নতুন শিক্ষিত শ্রেণীকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তাদের কাজের উপযোগী করে তোলেন। এই শিক্ষিত সমাজের উদ্দেশ্যে ছিল ইংরেজদের অনুকরণে ভারতীয় সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন করা। এসময় বনিক, মুৎসুদ্দী, দালাল, জমিদার, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগকারী অর্থাৎ নতুন এসকল পেশাজীবীর সমন্বয়ে সমাজ বিন্যাসের মাধ্যমে এদেশের বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠে। উনিশ শতকে বাংলার নব-জিজ্ঞাসার ধারক ও বাহক বলা যায় এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকেই। ঐতিহাসিক বিপিন বসু এই নব-জিজ্ঞাসার সূচনা পর্বে তিনটি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেছেন। প্রথমত : এই সময় বাঙ্গালী জীবন পুরোপুরি দৈবনির্ভরতা কাটিয়ে কিছুটা মানবমুখী হয়ে ওঠে এবং নিজেদের ওপর কিছুটা বিশ্বাস তৈরি হয়। দ্বিতীয় : অদৃষ্টবাদী বাঙ্গালীর জীবনে যুক্তিবাদ স্বল্পমাত্রায় হলেও প্রবেশাধিকার পায়, ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী হয়ে ওঠে বর্হিমুখী, আর একই সঙ্গে অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে সে তার নিজের ভাগ্য নির্মাণে ব্রতী হয়। তৃতীয়ত : এই সময়ে কিছুটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারীমুক্তি আন্দোলনের ফলেই। এ পর্যায়ে নারীকে ভোগ্য হিসেবে না দেখে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে মর্যাদা দেবার চর্চা শুরু হয়।

শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন সমাজ কাঠামো তৈরি হতে থাকে। শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে নারীরা ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হতে থাকে। এই জাগরণের পথ উন্মুক্ত হলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকার, উন্নয়ন, প্রগতির দাবি উত্থাপনের প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলনের সূচনা হয় মূলত দুটি ভিন্ন ধারায়। এর একটি সংস্কারমূলক ধারা ও অপরটি উপনিবেশ-বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ধারা। নারীমুক্তি আন্দোলনের এই দুটি ধারার মধ্যে একটা মিল পাওয়া যায়। এই নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্যের সামাজিক বিপ্লবের ফলে পাশ্চাত্যের নারী সমাজের অগ্রগতি, নারী শিক্ষা আন্দোলন, ভোটাধিকার আন্দোলন ও অন্যান্য অধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন।

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করার পর ভারত তথা কলকাতা প্রশাসনিক কাজের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর ফলে বাংলায় দীর্ঘদিনের অচলায়তনে প্রথম আঘাতটি ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি করে। ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি উপলব্ধি করে যে, ভারতবর্ষের প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা গুটি কয়েক ইংরেজ কর্মচারীর দ্বারা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বিস্তার ঘটতে থাকলে শাসকগোষ্ঠী ও শাসিতের চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ও জনসমর্থনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। এই উপলব্ধি থেকে ইংরেজ শাসকেরা এদেশের জনগণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং এদেশীয়দের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮১৩ সালে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন।[১১]

বাঙ্গালীদের একাংশ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত পুরুষ প্রবেশ করে একটি নতুন জগতে। এই নতুন পরিমণ্ডলে তারা পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক, যুক্তিবাদী ধ্যান-ধারণার আলোকে আলোকিত হয়। এই আলোকিত পুরুষদের একাংশের মনে প্রথম প্রশ্ন ওঠে তৎকালীন ভারতীয় তথা বাংলার সমাজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার নিয়ে। তারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন করে বিশ্লেষণ করতে শুরু করে। সমাজকে যে বিষয়টি নব্য চিন্তাবিদদের সর্বাধিক আকর্ষণ করে তা হল বাঙ্গালী সমাজে নারীর অবস্থান। তখন শিক্ষিত পুরুষের নিকট অশিক্ষা আর কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে থাকা, চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ নারী বিসদৃশ্য মনে হতে থাকে। এর একটি প্রধান কারণ ইংরেজরা এদেশে এসে অন্তঃপুরের ধারণাটাই পাল্টে দেন।[১২] এরপরই খ্রিষ্টান মিশনারীরা নারীদের এ অবস্থা থেকে তুলে আনার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। মিশনারী সমাজের মধ্যে চালর্স গ্যান্ট ১৭৯২-তে Observations on the state of society among the Asiatic subjects of great Bretain নামে এক প্রবন্ধে ভারতীয়দের প্রসঙ্গে বলেন, "While men were bound by no moral restraint and lived with the insensibility

Dhaka University Institutional Repository

of brutes, Indian women were doomed to a life of servitude and self-imprisonment and a violent and premature death."[১৩] ইংরেজরাও তাদের বিভিন্ন লেখায় নারীর খারাপ অবস্থার কথা তুলে ধরেছেন। ১৮১৮ সালে জেমস স্টুয়ার্ট মিল তাঁর *History of British India* তে বলেন, "The condition of women is one of the most remarkable circumstances in the manners of nations. Among rude people, the women are generally disregarded; among civilized people they are exhalted."[১৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগ থেকে ভারত ও বাংলায় নারীর অধিকার ও স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন সূচিত হয়। বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক, মনীষীরা ছিলেন এর পুরোধা। সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে আইনগতভাবে ১৮২৯ সালে নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে সমাজ সংস্কারের পথে বলিষ্ঠ নির্দেশনা সূচিত হয়। তখন বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ নিরোধ, নারীর সম্পত্তি অধিকারসহ বেশ কিছু আইন পাশ হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রামমোহন রায় সমাজের নানাধরনের সংস্কার সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন, 'আত্মীয়সভা'। এই 'আত্মীয়সভা' বাংলার রিফর্মেশনের 'ড্রাফট প্রোগ্রাম' (Draft programme) বা খসড়া কর্মসূচির তালিকা তৈরি করে। তার মধ্যে নারীদের অধিকার ও শিক্ষা-সাংস্কৃতির বিষয়গুলি ছিল।[১৫]

ডিরোজারিয়োর 'ইয়াং বেঙ্গল' দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'ব্রাহ্মসমাজ' নারীর অধিকার ও স্ত্রী শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দেয়। ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়' 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' আজ পর্যন্ত সেই ঐতিহ্য ধারণ করছে। রামমোহনের পরই ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তিনি নারীর উপর সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান ও নারী শিক্ষা বিস্তারে জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি নিজেই বলেছেন- 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।' সতীদাহের বিরুদ্ধে তিনি বলেন, "একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এইরূপ উপযোগী জন্তু ব্যতীত মহিলাদের আর কিছু বিবেচেনা করা হয় না।"[১৬] তিনি নারীদের করুণ অবস্থার জন্য পুরুষদের দায়ী করেন। আরো বলেন যে, "স্ত্রীলোকের শারীরিক পরাক্রম পুরুষ হইতে প্রায় ন্যূন হয়, ইহাতে পুরুষেরা তাহাদিগকে আপনা হইতে দুর্বল জানিয়া যে উত্তম পদবীর প্রাপ্তিতে তাহারা স্বভাবত যোগ্য ছিল, তাহা হইতে উহাদিগকে পূর্ব্বাপর বঞ্চিত করিয়া আসিতেছে, পরে কহেন যে, স্বভাবতই তাহারা সেই পদ প্রাপ্তির যোগ্য নহে।"[১৭] স্ত্রীলোক অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এই ধারণাই সমাজে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত ছিল। যার কারণে শিক্ষা ও সমাজের অন্যান্য কাজের জন্য সে অনুপযুক্ত। এ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর বলেন যে, "স্ত্রীলোকদিগকে বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে, তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন ? কারণ বিদ্যাশিক্ষা এবং জ্ঞান দিলে, পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্প বুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে, আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, ইহা কীরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতি, কর্ণাট রাজপত্মী, কালিদাসের পত্মী প্রমুখ যাহাকে বিদ্যাভাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রপরায়ণ রূপে বিখ্যাতা আছেন।"[১৮] ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছোঁয়ায় উনিশ শতকের প্রথম দিকে উদীয়মান বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংস্কার লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কার দুটি ধারায় দেখা যায়। তার মধ্যে একটি ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করা। এ প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম মনজুর বলেন, "রামমোহনের সংস্কার আন্দোলনের বিশালতার মাঝে যে কটি বিষয় যুগের প্রেক্ষিতে প্রগতির ধারা বহন করছিল এর মধ্যে অন্যতম হলো নারী জাতির জন্য আন্দোলন।"[১৯]

সতীদাহ প্রথা

ভারতীয় সমাজে কুসংস্কারের অন্যতম বিষয় ছিল সতীদাহ প্রথা। হিন্দুশাস্ত্রের সংহিতা থেকে জানা যায় যে, মানবদেহে সাড়ে তিনকোটি পশম আছে, যে স্ত্রী স্বামীর সাথে সহমৃতা হন অর্থাৎ স্বামীর অনুগমন করেন, তিনি সাড়ে তিনকোটি বৎসর স্বর্গে বাস করেন।[২০] একথা বলাই বাহুল্য প্রাক-সামন্ত কিংবা সামন্তযুগে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে এই জাতীয় বর্বর প্রথার উদ্ভব হয়েছিল। প্রচলিত বিশ্বাস মোতাবেক সতীর সিদুঁর মাথায় দিলে, তার ব্যবহৃত শাখা পরলে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো না বলে সতীর শেষ সিদুঁর ও শাখা পাওয়ার জন্য স্ত্রীলোকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।[২১] সতীদাহের জন্য নারীকে নানাভাবে চাপ দেয়া হতো, যদি এতে রাজি না হতো তাহলে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে নারীকে রাজি করানো হতো। শুধু তাই নয়, সহমরণের পরে সতীকে নারীরা পূজা করত। সতীদাহ হওয়ার পরে হিন্দুরা নদীর তীরে একটি ছোট সমাধি মন্দির তৈরি করে দিতো, তার নাম ছিল সতী মন্দির। গঙ্গা স্নানে যাতায়াতের পথে হিন্দু নারীরা সেই মন্দিরে ভক্তিসহকারে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করতো এবং বলতো জন্ম-জন্মান্তরে যেন তোমার মতো পূণ্যবতী সতী হতে পারি।[২২]

উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনামলে অধীনে এ দুর্নীতি, ধর্মান্ধতা ও কুসঙ্কারের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ছিল। এসময় বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নতুন এই রূপের প্রভাব নারী সমাজের ওপর পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন-নিপীড়ন ইত্যাদি ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে নিজের মতামত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেন। ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়সভা'র খসড়া কর্মসূচিতে তিনি 'নারী অধিকার ও শিক্ষা' বিষয়টি সংযুক্ত করেন। ১৮১৮ সালে তিনি সতীদাহের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করেন। সতীদাহের ঘটনা রামমোহন রায়ের পরিবারেও ছিল। সেই ঘটনা অনুধাবন করে তিনি এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর এই প্রথা নিবারণে এক আইন পাশ করা হয়।[২৩]

বিধবা বিবাহ

এসময় বিধবা নারীদের আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়। তখন কোন নারীর স্বামী মারা গেলে স্বামীর বাড়ি অথবা বাবার বাড়িতে তাকে আজীবন কাটাতে হতো। সমাজের অচ্ছুত মানুষের মতো তার জীবন কাটতো। লাঞ্ছনা, মানসিক নির্যাতন সঙ্গী করে বাকি জীবন পার করতে হতো। বধুটি অবাঞ্ছিত হয়ে সমাজে টিকে থাকতো। এসবের কোন প্রতিকার ছিল না। হিন্দু- মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এ কুপ্রথা বিরাজ করছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর *বিধবা গঞ্জনা* ও *বিষাদ ভাণ্ডার* গ্রন্থে বৈধব্য জীবনের লাঞ্ছনা, ধিক্কার-বঞ্চনার চিত্র তুলেছেন। মেহেরুল্লাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের অভিশপ্ত এই নীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, "মোদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিধবাদের বিবাহ না দেয়ায় সেখানের সমাজে ব্যাভিচার বাড়ছে।"[৫০] বিধবাকে বিবাহ দেয়াকে মুসলমান সমাজের লোকজন খুব খারাপভাবে দেখতো। মুসলমাদের মধ্যে এই ধারনা দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিল যে, বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কাজ। এছাড়া নারী নির্যাতনের আরেকটি ধাপ হচ্ছে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ। তালাক প্রথার অপব্যবহার করার মাধ্যমে নারী জীবনে সীমাহীন দুর্গতি ছিল। মুসলমানরা নারীকে এক অস্থাবর সম্পত্তি মনে করতো। পুরুষরা নিজেদের প্রয়োজন বা রিপুর তাড়নায় যথেচ্ছভাবে নারীকে তালাক দিতো। মুসলমানরা তালাক দেয়াকে খুব সাধারণ ব্যাপার মনে করতো। খুব তুচ্ছ কারণেও তারা সচরাচর স্ত্রীদেরকে তালাক দিতো।

Dhaka University Institutional Repository

বহুবিবাহ প্রথা

বাংলার আরেক অভিশাপ বহুবিবাহ প্রথা। এ বহুবিবাহ প্রথা তৎকালীন সময়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। বহুবিবাহের স্বীকার নারীর কোন সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিল না। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে শিক্ষিত সমাজ সোচ্চার হয়। ১৮৬৭ সালে মুনশীনামদার তাঁর *দুই সতীনের ঝগড়া* তে বহুবিবাহের কুফল সর্ম্পকে মুসলমানদের সর্তক করে দেন।[৩৮] ১৮৯০ সালে নৌসের আলী খান ইউসুফজাই তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেন একাধিক বিয়ের ফলে অধিক সন্তানের জন্ম হয়, পারিবারিক বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং নারীদের মধ্যে আত্মহত্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁর মতে বাংলার মুসলমান সমাজে ১০০০ বিবাহিত পুরুষ পিছু ১০৩৩ জন বিবাহিত মহিলা রয়েছেন। অর্থাৎ ৪ শতাংশ বিবাহ বহুবিবাহ ঘটিত।[৩৯] একজন ব্যক্তি যখন একাধিক বিয়ে করে তখন সে সকল স্ত্রীর সাথে সমান ব্যবহার করতে পারে না এবং সবার চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে পারিবারিক অশান্তি, কোন্দল, হিংসা, ঝগড়া লেগে থাকে। অনেক সময় আত্মহত্যা পর্যন্ত গড়ায়। ১৯২০ সালে নারী জাতির দুর্দশার জন্য পুরুষ জাতিকে দায়ী করেন। এ সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন, "We would accost our mothers, aunts, sisters or cousins, for glimpses of the unknown Muslim antapur"[৪০] শেখ জমিরউদ্দিন ইসলাম প্রচারক এ প্রকাশিত *মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার* শীর্ষক প্রবন্ধে বহুবিবাহ সম্পর্কে একটি বিশাদ তথ্য তুলে ধরেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন- মুসলিম বঙ্গদেশে প্রায় তিনকোটি লোক বসবাস করে। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানদের কেউ দুই, কেউ তিন, কেউ চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরজনকে বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে..... বর্তমান সময়ে মুসলমানরা যে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য, কেবল কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হইয়া যাইতেছে।[৪১]

বহুবিবাহের মাধ্যমে পুরুষ অনেক নারীকে বিবাহ করত। আর এর মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে তারা কাজের লোক হিসেবে ব্যবহার করত এবং শারীরিক চাহিদা মেটানোর মাধ্যম মনে করতো। এতে করে পারিবারিক অরাজকতা বাড়ত এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেতো। ১৯০৭ সালে *বহু বিবাহ* প্রবন্ধে কাজী ইমদাদুল হক এক বিয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। *নবনূরে* প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বহুবিবাহকে বাঁদী প্রথার নামান্তর বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, সাধারণ মুসলমান সমাজে যে অদ্যাপি বহুবিবাহ প্রথা বর্তমান রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তি শাস্ত্র বিধান নহে। ..... আমাদের সমাজে যে বাঁদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে উহা একমাত্র তাহাদের সৃষ্টি এবং যে বহুবিবাহের যে অযথা প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে

Dhaka University Institutional Repository

তাহাও তাহাদের স্বার্থসমুদ্ভূত।[৪২] মুসলমান সমাজে যে বহুবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে তা কোরান-হাদিসের দোহাই দিয়ে বলা হয়। কিন্তু আসলে তা নয় বরং পুরুষের খাম-খেয়ালীপনা আর নিজেদের সুবিধার্থে এ নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। এস ওয়াজেদ আলি বহুবিবাহের পক্ষে ফতোয়াকে পুরুষজাতির স্বার্থপরতা বলে অভিহিত করেছেন।[৪৩] কিছু পুরুষ বহুবিবাহকে উৎসাহ দেন যা নির্লজ্জতার নামান্তর।

বাল্যবিবাহ

ব্রিটিশ শাসনের অধীনে মানুষ তখন সদ্য লেখাপড়া করছে। নিজেদের সুপ্ত, কোমল বৃত্তিগুলো তখনও প্রকাশ পায়নি। এজন্য মানুষ অত্যন্ত অসচেতনভাবে অল্প বয়েসী ছোট ছেলে- মেয়েদের বিয়ে দিতো। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেন, পাত্র-পাত্রী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর নির্বাচন করিয়া বিবাহ করে, তাহাই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত। এইরুপ নির্বাচন বিবাহ ইসলামেও অনুমোদিত। তিনি আরো বলেন, যুবকদের পক্ষে ২৩/২৪ বছরের পূর্বে এবং মেয়েদের পক্ষে ১৪/১৫ বছরের পূর্বে বিবাহ করা যুক্তি সংগত নহে।[৪৪] পাত্র-পাত্রী বিয়ের পূর্বে নিজেদেরকে যাচাই-বাছাই করবে সেটাই সঠিক কিন্তু তারা যেনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়। অথাৎ বিয়ের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বয়স নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। মাসিক *মোহাম্মদী*তে বাল্যবিবাহ রোধে আইন প্রণয়নের কথা তুলে ধরা হয়। এই পত্রিকার ভাষ্য মতে, বালকদের বিবাহের বয়স ১৮ এবং বালিকা বিবাহের বয়স ১৪ বছর নির্ধারিত হওয়া উচিত।[৪৫] বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বয়স নির্ধারণ করা অতীব প্রয়োজন। বিয়ের বয়স সেসময় নির্ধারিত ছিল না। ফলে যেকোন পরিবার যখন তখন ছেলে-মেয়ে বিয়ে দিতে পারতো। *এছলামবাদী* পত্রিকায় লেখা হয়, ফলত এই বাল্যবিবাহ প্রথা স্বাস্থ্যনীতি ও অর্থনীতির দিক দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। ছেলে যখন স্বয়ং অর্থোপর্জন করিতে সক্ষম হইবে, স্বোপার্জিত অর্থ দ্বারা বিবাহ করিতে পারিব, তখন ছেলের বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।[৪৬] অল্প বয়েসী পাত্র-পাত্রীরা অর্থনেতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী নয়, তারা পরিবারের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নিজেরা বহন করতে পারে না। এছাড়া অল্প বয়েসে সন্তান ধারণ করায় নারীদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। নিজেরা অপুষ্টির স্বীকার হয় এবং তাদের সন্তানেরাও অপুষ্টির স্বীকার হয়।

মোয়াজ্জিন পত্রিকাতে বাল্যবিবাহের তীব্র সমালোচনা করা হয়। মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাল্যবিবাহের সমালোচনা করে বলেন শিক্ষা বিস্তারের সাথে সাথে এই প্রথা বিলুপ্ত হওয়া উচিত। এস. ওয়াজেদ আলীর মতে, বাল্যবিবাহ উচ্চাকাঙ্ক্ষার ডানা কাটিয়া দেয়।[৪৭] বাল্যবিবাহ করায়, ব্যক্তির উপর অনেক চাপ থাকে। ফলে তার উচ্চস্বপ্নের বিকাশ হয় না। মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী এর সমালোচনা করে

Dhaka University Institutional Repository

বাল্যবিবাহকে সমাজ ধ্বংস করার একটি উপায় বলে মনে করেন। বাল্য-বিবাহের ফলে পাত্র-পাত্রীর স্বাস্থ্য বিনাশ হাওয়া অবশ্যম্ভাবী।[৪৮] *আল ইসলাম* পত্রিকায় সিদ্দিক আহমদ রামপুরী বাল্যবিবাহ রোধে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন-"এস, আমরা হাতে কোরআন মুখে আল্লাহর নাম নিয়ে শপথ করি-পূর্ণ যৌবন সমাগত না হইলে কেহ দায় পরিগ্রহ করিব না, পঞ্চবংশতি বর্ষ গত না হইলে কেহ স্ত্রীর নাম মুখে আনিব না।"[৪৯] বিভিন্ন মনীষীরা বাল্যবিবাহের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট না থাকার পরও কম করে হলেও আনুমানিক পনের বছর হলে বিবাহ করাই শ্রেয়। ঊনবিংশে একটি অভিশাপ ছিল বাল্যবিবাহ। বাল্যবিবাহ করার নারী-পুরুষের স্বাস্থ্য সমস্যা ও পুষ্টির অভাব থাকায় যেসকল সন্তানের জন্ম হতো, তারাও অসুস্থ হতো। তাই বিভিন্ন পত্রিকা, লেখক, মনীষীরা বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য, সমাজকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন।

পর্দা ও অবরোধ প্রথা

ঊনবিংশ শতকে নারীশিক্ষা, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ বিষয়গুলো সবচেয়ে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীরা পর্দা ও অবরোধ প্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন। *ইসলাম প্রচারক* পত্রিকা এ অবরোধ প্রথা নিয়ে সম্ভবত প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঐ পত্রিকায় শ্যামসুন্দরী দেবী *সবিত্র* প্রবন্ধাবলীতে অবরোধ প্রথা সর্ম্পকে একটি রচনা প্রকাশ করেন, সেখানে তিনি এই প্রথাকে কারাবাসের সাথে তুলনা করেন।[৩১] খাজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা মোহাম্মদ আগা খান ১৯০৩ সালে দিল্লিতে মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে পর্দাপ্রথাকে সমাজের জন্য অনিষ্ঠকর বলে উল্লেখ করেন। *মাসিক মোহাম্মদী* ও *সওগাত* পত্রিকায় পর্দা ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নারীর অপ্রয়োজনীয় পর্দাকে কারাবাসের সাথে তুলনা করে এ প্রথাকে সকল অগ্রসরতার প্রতিবন্ধক বলে উল্লেখ করে। বাস্তবতা হচ্ছে নারী সেসময় সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ ছিল। *মোহাম্মদী*তে বলা হয় আমরা বর্তমানে অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী নহি। এছলাম মুছলমানদেরকে পর্দা সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়েছে এবং হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ও আদর্শ হইতে আমরা স্ত্রীলোকদেরকে অনুরূপে আবদ্ধ রাখার কোন প্রমাণ বহু চেষ্টা করেও পাই নাই । ভারতবর্ষের বাইরে এই শ্রেণীর জল্লোদী পর্দাপ্রথার প্রচলন নাই।[৩২] *সওগাতে* লেখা হয়- "পর্দা প্রথা বর্জন করিয়া তুরস্ক অশেষ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। আজ তুর্কি নারী তাই তুরস্কের যাবতীয় কল্যাণ আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাহার শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি সর্বত্র তুর্কি নারীর অবাধ গতি..... পর্দাপ্রথা আমাদের প্রাণশক্তি

Dhaka University Institutional Repository

খর্ব করিতেছে। আপনারা সত্যকার দেশপ্রেমিক ও সমাজ হিতৈষীর মত এই সর্বনাশী পর্দাপ্রথাকে একেবারে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণ করুন।"[৩৩] কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতায় আসার পর থেকে নারীদের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেন। এর মধ্যে পর্দাপ্রথার সংস্কার অন্যতম। তখন থেকে তুর্কি নারীরা স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করে, নিজেরা নিজেদের কাজ করে। পর্দা তাদের জীবন-জীবিকার অন্তরায় হয়নি। এসবের কারণেই কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছে, 'তুর্কি মহিলার ঘোমটা খোলা'।

স্বাস্থ্যের সুফল-কুফল এসবের দিকে লক্ষ্য করে *সওগাত* পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। ডাক্তার বেন্টলীর স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবরণী দেখলে জানতে পারা যায় কি ভয়াবহ রূপে মুসলিম মেয়েরা যক্ষারোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব, অর্থাৎ পর্দা। এদিকে স্বাস্থ্যহীন মেয়েরা যে সন্তান প্রসব করেছেন সেই সন্তানরাও স্বভাবত দুর্বল স্বাস্থ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে।[৩৪] নারীরা অসচেতন ও পর্দায় অবরুদ্ধ থাকায় ঠিক মতো চিকিৎসা নিতো না। যক্ষা রোগ হলে মানুষের আলো বাতাসের প্রযোজন হয়। কিন্তু তারা পর্দায় এমনভাবে আবৃত্ত থাকত যে তাদের শরীরে আলো বাতাস লাগতো না। ডাক্তার আব্দুল মালেকের মতে- ভারতের মহিলারা অবরোধ প্রথার কারণে মুক্ত আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত থাকে বলে তাদের ক্ষয়রোগ বেশি হয়। এই সমস্ত রোগিনীদের মধ্যে মুসলমান নারীর সংখ্যা অধিক। কারণ মুসলমান নারীকে বার থেকে বিশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অজ্ঞাতবাসে (বাবার বাড়িতে) এবং বিশ থেকে ত্রিশ বছর কারাবাসে (স্বামীর বাড়িতে) রাখা হয়।[৩৫] তবে এস. ওয়াজেদ আলী অভিমত করেন যে, পর্দা অর্থাৎ অবরোধ প্রথা ছিল না। এই প্রথা ইরানি সভ্যতার প্রভাবে সৃষ্ট, যা হযরত মহাম্মদ ও তার শিষ্যদের মৃত্যুর অনেক পরে আমদানি করা হয়েছে।[৩৬] আব্দুল হোসেন পর্দা প্রথার কুফল সর্ম্পকে বলেন, পর্দা আজ মুসলমান নর-নারীর পাশবিক প্রবৃত্তি প্রখর করে তোলার জন্য একটি ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠেছে। এতে তাদের দুর্বলতা, নির্লজ্জতা, সংকীর্ণতা, হৃদয়হীনতা, রুচিবিকৃতি, কার্পণ্য, স্বাস্থ্যহীনতা, বিগতস্পৃহা ও আলস্য দিন দিন বেড়ে চলছে। ..... পর্দার অন্তরালে মুসলিম নারীর দুর্বলতা এরূপে লালিত হয়ে থাকে যে, তার ব্যক্তিত্ব একেবারে পুষ্টিলাভ করতে পারে না, ফলে সামান্য ইঙ্গিত বা প্রলোভনেই পাশবিক লালসায় স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে বাধ্য হয়।[৩৭] হুমায়ন কবীর, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কাজী ইমদাদুল হক মিলন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও 'শিখা গোষ্ঠীর' সদস্যরা পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নারীশিক্ষা

সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রচলনসহ সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু হওয়ার পরে সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে এ উপলব্ধি জাগ্রত হয় যে, মেয়েদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে স্ত্রীশিক্ষা। উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনে স্ত্রীশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে চেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হলেও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের প্রচলিত কুসংস্কার ও ধারণা দূর করা সম্ভব হয়নি।[২৪] নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধির একটি অন্যতম একটি বিষয় ছিল যে, শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে বিবাহ, পারিবারিক জীবন ও পারিবারিক সর্ম্পকের বিষয়ে প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন। জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য সমাজ ও একপ্রকার তাড়না অনুভব করতে থাকে। এসময় কবিগণও তাদের লেখনির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *বামাবোধিনী* পত্রিকায় বলা হয়, "পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় অন্বেষণ করিবেন, একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা, একসঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, একসঙ্গে ধর্মালোচনা, একসঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান, একসঙ্গে শয়ন, একসঙ্গে ভোজন, একসঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদির ঈশ্বারাভিপ্রেত কর্তব্যসকল নিস্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরববৃদ্ধি করিবেন।"[২৫] বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত সহধর্মিণী হিসেবে নারীকে গড়ে তোলবার জন্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে যুক্তিটি প্রাধান্য পেয়েছিল। কাজেই বলা যায় পুরুষের নিজের কারণেই নারীকে শিক্ষিত করার প্রয়োজন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাময়িক পত্র ও বিভিন্ন গ্রন্থে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার উপর মত প্রদান করা হতো। ১৮৪৯ সালে *ভারতীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা* ও *হিন্দু লোকস্ত্রীদের বিদ্যাশিক্ষার কর্তব্যতা* এই প্রবন্ধ দুটি শ্রেষ্ঠ পুরষ্কার অর্জন করে। ১৮৫৭ সালে দ্বারকানাথ *স্ত্রী-শিক্ষা বিধানে* তিনি উল্লেখ করেন কন্যা ও পুত্রের শিক্ষার কোন ভেদাভেদ নেই। ঠাকুর বাড়ির স্বর্ণকুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তারা বাহিরের জগতের সাথে যোগাযোগ তৈরি করার জন্য 'লেডিস থিওসফিক্যাল সোসাইটি' গঠন করেন। এরপরে 'সখী সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতির কাজ ছিল সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের একত্রিত করা। দেশহিতকর কাজ করা, শিক্ষা বিস্তারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, শিল্প-চেতনাবোধ তৈরি প্রভৃতি। যা বৃহত্তর জাতীয় চেতনার প্রকাশ ঘটায়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা ব্রজসুন্দর মিত্র প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি ১৮৭৫ সাল থেকে ইডেন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। তাঁর কর্মস্থল কুমিল্লাতে হওয়ায় সেখানেও স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাকিনার জমিদার মহিমারঞ্জন রায় ১৮৬৩ সালে রংপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। 'বামাবোধিনী সভা' ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত নারী জাতির জন্য প্রথম কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান। এখানে বাঙ্গালী নারীর লেখা প্রথম প্রকাশ করা হয়। এই সংগঠনের ১৯টি শাখা বাংলার নানা প্রান্ত থেকে নারীদের শিক্ষা ও অধিকার নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। ১৮৭৯ সালে ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোক্তারা মহিলাদের নেতৃত্বাধীন 'বঙ্গ মহিলা সমাজ' গঠন করে নারী প্রগতির পথে এগিয়ে যান। এসময় নারীরা অনুধাবন করেন যে, শিক্ষিত নারী যদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ না করে তাহলে শিক্ষার অপচয় হবে। তখন থেকে নারীরা জীবিকা অর্জনের জন্য পেশা হিসেবে শিক্ষকতা, চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ১৮৭৫ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ভর্তির বিষয়ে পত্র লিখেও উত্তর পাননি। এর মধ্যে দেহড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী চন্দ্রমুখী বসু (১৮৬০-১৯৪৪) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার অনুমতি চান। এতে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।[২৬]

বলাবাহুল্য যে, উনিশ শতকে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে সমাজে চরম বির্তক ছিল। ১৮৩৬ সালে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ইউলিয়াম অ্যাড্যাম মন্তব্য করেন, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে খুবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা মনে করত মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হয়ে যাবে। আবার কেউ কেউ মনে করত মেয়েরা শিক্ষা অর্জন করলে পুরুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। এই কারণে এদেশীয় লোকেরা নারী শিক্ষা প্রসারে পদক্ষেপ নেয় নি। উপরন্তু যে-কোন রকমের মৌলিক জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েদের বাধা দান করেছে।[৫১] অ্যাডামস এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "There was not only nothing done in a native family to promote female instruction, but an anxiety is often evinced to discourage any inclination to acquire the most elementary knowledge"[৫২] তখন অধিকাংশ পরিবারের বাবা-মা মেয়ে সন্তানদের শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। তারা মনে করত লেখাপড়া মেয়েদের জন্য কল্যাণকর হবে না। এজন্য অভিভাবকরা মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী ছিল না। তবে মুসলমান সমাজের অবস্থা খুব খারাপ ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

লর্ড ডালহৌলি স্বীকার করেন যে, বাংলায় নারী শিক্ষা প্রসারে ব্রিটিশ সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। চার্লস উড বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি হয়ে, নারী শিক্ষা বিষয়ে পদক্ষেপ নেন। তিনি বলেন, "The importance of female educaton in India cannot be overrated; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives to give a good educaton to their daughters."[৫৩] সুতরাং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। কিছু কিছু প্রদেশের জনসাধারণ স্থানীয় সংস্থাগুলোকে নারী শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেয় না এবং নারী শিক্ষার জন্য কোন অর্থ ব্যয় করে না।[৫৪] ইংরেজরা নিজেদের সুবিধার্থে এদেশে থাকলেও শিক্ষার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বরং ইংরেজরা এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতই নষ্ট করে ফেলে। তারা 'ড্রাউন এন্ড ফিলটারেশন' পদ্ধতি চালু করেছিল। এছাড়া ইংরেজরা শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় করতে চায়নি। যার ফলে ১৭৫৭ সাল থেকে পরবর্তী ১০০ বছর শিক্ষাক্ষেত্র ছিল চরম অবহেলিত। এতে পুরুষ ও নারী উভয় শিক্ষাই অগ্রসর হয়নি। তবে এসময় পুরষরা এগিয়ে থাকলেও নারীরা পিছিয়ে পড়ে। নারীদের কোন উন্নয়ন হয়নি বললেই চলে। মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে কুংসঙ্কার লক্ষ্য করে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৮৮২-৮৩) মন্তব্য করে "One great objection made by the native public to the instruction of the girls is that it is of no practical use to them."[৫৫]

১৮৮৭-৮৮ সাল থেকে ১৮৯১-৯২ সালের রিপোর্টে বলা হয় এদেশের অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে অনিচ্ছুক, কারণ তারা মনে করেন মেয়েরা লেখাপড়া শিখে শিক্ষিত হলে ঘরের কাজে অবহেলা করবে।[৫৬] অনেক অভিভাবক তাদের মেয়েদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিদ্যালয়ে পাঠাতো না। তবে অধিকাংশ মানুষ ছিল অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা তাদের সন্তানের ভবিষ্যত ভাবার মতো দুরদর্শি ছিল না। অভিভাবকরা মেয়েদের দিয়ে ঘরের কাজ করানো, সূচিকর্ম করা এ জাতীয় কাজ করাকেই শ্রেয় মনে করতো। উঁচু ক্লাসে প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্রী পাওয়া যেতো না। কারণ, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় অচেনা পুরুষের দৃষ্টি পড়বে এজন্য অভিভাবকরা তাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতো না। ভারত সচিব ই.সি বেইলি এ বিষয়ে বলেন, "In case of higher class, it is impossible to get a number of adult female together, as to from a school, least they should be exposed to the observation of stangers."[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

বেঙ্গল সোস্যাল অ্যাসোসিয়েসনের সভায় Mohammodan Education in Bengal প্রবন্ধ পাঠকালে প্যারীচাঁদ মিত্র আব্দুল লতিফের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান মেয়েদের শিক্ষায় কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা। প্যারিচাঁদের কথায় আব্দুল লতিফ কোন উত্তর দেননি, উত্তর দিয়েছিলেন মৌলভী আব্দুল হাকিম। তিনি বলেছিলেন, "স্কুল কলেজের সমর্থন করেন না। অন্য সম্প্রদায়ের মতো মুসলমানরা তাদের মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে পারে না। ধর্মের কারণে তারা মেয়েদের পর্দানশীল করে রাখতে বাধ্য। অন্য সম্প্রদায়ের মতো তারাও তাদের ধর্মবিধি পালন করতে বদ্ধপরিকর।"[৫৮] তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে মেয়েদের শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না। ১৩২৬ বঙ্গাব্দে *আল-ইসলাম* পত্রিকায় আব্দুল রহমান *শিক্ষার ভিত্তি* নামক প্রবন্ধ লেখেন। আব্দুল রহমান, সুপারিশ করেন যে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বালিকারা কোরান, বাংলা, অঙ্ক, স্বাস্থ্য, চরিত্রগঠন বিষয়ক শিক্ষা, হস্তলিপি, উর্দু, ইতিহাস ও ভূগোল, সূচিশিল্প, রন্ধনশিল্প, সন্তান ও পরিবার পালন, গৃহরক্ষা বিষয়ক শিক্ষা প্রভৃতি অর্জন করবে।[৫৯] এসময় মৌলভী আব্দুল হাকিমের মতো অধিকাংশ মানুষ নারীদের আধুনিক শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের গৃহবন্দি করে রাখা হতো। ঘরোয়া বিষয় জানা এবং কোরান, বাংলা, হস্তলিপি এসকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাকে গুরুত্ব দেয়া হতো। যার ফলে দীর্ঘদিন এদেশের নারীরা শিক্ষা, স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত ছিল।

সওগাত পত্রিকায় নরুন্নেসা খাতুন *নারীজাতির শিক্ষা* প্রবন্ধে উল্লেখ করেন ইসলামী শিক্ষা ত্যাগ করে ব্রাহ্ম সমাজের মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মিশনারী স্কুলে গমন করা অনভিপ্রেত, যতদিন না পর্যন্ত মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল স্থাপন করা যাচ্ছে। ততদিন গৃহের মধ্যেই তাদের শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে হবে।[৬০] অন্য ধর্মাবলম্বী মেয়েদের মতো মুসলমান মেয়েদের মিশনারী স্কুলে পড়া অনেকের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তারা মনে করত মুসলমান মেয়েদের জন্য আলাদা বিদ্যালয় থাকা উচিত। উনবিংশ শতকে মানুষ উদার চিন্তাধারার অধিকারী ছিল না। রহিমা খাতুন মিল্কি *সওগাত* পত্রিকায় বলেন, পাশ্চাত্য ধারায় ছেলে-মেয়েরা গৃহের বাইরে গিয়ে সেভাবে স্কুলের লেখাপড়া শিখে, ঠিক সেভাবে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদান সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হবে না, ইসলামী ধ্যানধারণা বর্জিত শিক্ষা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।[৬১] এ সর্ম্পকে ফাতেমা লোহনী বলেন, "ব্রাহ্ম, ইংরেজ এবং পার্সী মহিলাদের অনুকরণে মুসলিম নারীরা যদি রান্নাবান্না ও গৃহের অন্যান্য কাজে সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করে পড়াশুনা ও খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে গৃহস্বামীরা মেয়েদের বাড়ির বাইরে গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলে যোগদান করাকে ভালোভাবে মেনে নেবে না। মেয়েদের উচিত বাড়িতে বসে সেলাইফোঁড়, এমব্রডারি, সূচিশিল্পের কাজ করা এবং সামান্য অর্থ উপার্জন করা।"[৬২]

তৎকালীন সমাজে অভিভাবকরা মেয়েদের ঘরের কাজ, রান্না এসব গুরুত্ব না দিয়ে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাটা পছন্দ করতো না। তারা মনে করতো মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার পদ্ধতি আলাদা হওয়া উচিত। শিশুপালন, গৃহসজ্জা, স্বাস্থ্যবিধি, সঙ্গীত ও সূচিশিল্পের উপর তাদের ডিগ্রি দেওয়া উচিত। *সাওগাত* পত্রিকায় *স্ত্রী-শিক্ষা* শিরোনামে মুসলামন মেয়েদের শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি ছেলেদের থেকে পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে তাহেরুদ্দিন আহমেদ মত প্রকাশ করেন। তাঁর অভিমত হল মুসলিম মেয়েদের সাহিত্য, স্বাস্থ্যবিধি, বিজ্ঞান, গৃহসজ্জা, শিশুপালন, সঙ্গীত, সূচিশিল্পের কাজ, এমব্রডারি প্রভৃতিতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সন্তান প্রসব, শিশু পালন এবং ঘরদোর পরিপাটি রাখাই হলো মেয়েদের বি.এ ডিগ্রি-এটাই তার প্রকৃত পরীক্ষা।[৬৩] তবে মুর্শিদাবাদের নবাবপত্মী বেগম শামসি জাহান ফেরদৌসী মহল কলিকাতায় নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৬৪] ঢাকার নবাবেরা নারীশিক্ষা তো দূরের কথা, গৃহের কন্যারা যাতে সম্পত্তির ভাগ দাবি করতে না পারে, সেজন্য প্রায় অশিক্ষিত, অকর্মণ্য, অথর্ব পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাদেরকে অন্ত:পুরে আবদ্ধ রাখতেন।

শিক্ষার অধিকার, সামজিক অধিকার, পেশাগত অধিকার লাভ করার মাধ্যমে নারীদের ভাগ্য ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। এসব অধিকার প্রাপ্তির মাধ্যমে সমাজে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানও তৈরি হতে থাকে। তখন পুরুষরা নারীদেরকে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে বরং তাদেরকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্মলগ্ন থেকেই এর সদস্যপদ মহিলাদের জন্য অবারিত ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে অক্টেভিয়ান হিউম বলেন, "Political reformers of all shades of opinion never forget that unless the elevation of the female element of the nation proceeds *pari passu* (with an equal pace) with their work, all their labour for the political enfrachisement of the country will prove in vain."[২৭]

১৮৮৯ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনে ১০ জন মহিলা যোগদান করেন। এদের মধ্যে ছিলেন - স্বর্ণকুমারী দেবী, কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, পণ্ডিতা রামাবাঈ, মিসেস শেবান্তী বাঈ, নিকাম্বে, মিসেস কাশীবাঈ, কান্তিকর, মিস মানেকজী কারসেতজী প্রমুখ। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গাঙ্গলী প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০১ সালে কংগ্রেস অধিবেশনে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী চৌধুরানি একটি দেশাত্মবোধক সংগীত রচনা করেন এবং ৫০ জন মেয়েকে সমাবেত সংগীতের জন্য প্রশিক্ষণ দেন। ১৯০২ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেছিলেন লেভী বিদ্যাসাগরী নীলকান্ত ও তাঁর বোন সারদা মেহতা। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মহিলা নেত্রী ছিলেন ম্যাডাম কামা, অ্যানি বেসান্ত, মার্গারেট কাজিন্স ও সারোজিনী নাইডু।[২৮]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মনোভাব নারীদের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিকাশের পথ তৈরি করে। স্বদেশী শিল্পের প্রচার শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। বিদেশী শিল্প বর্জন আন্দোলন শুরু হলে স্বদেশী শিল্প চালু করার জন্য সরলা দেবী চৌধুরানি 'লক্ষীভাণ্ডার' নামে একটি আড়ত খোলেন। বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা বয়কট আন্দোলন যখন চরম আকার ধারণ করে সেসময় বীরাষ্টমী মেলার আয়োজন করা হয়। এর মাধ্যমে শক্তি চর্চাব্রত অবন্ধন ও রাখীবন্ধনের মতো কর্মসূচিকে স্বদেশী আন্দোলনের সাথে সাংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে নারীরা সক্রিয় ছিলেন। নবশশী সেন, সুশীলা সেন, কমলকামিনী গুপ্ত প্রমুখ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। 'স্বদেশবান্ধব সমিতি' র সাথেও যুক্ত হন তাঁদের কেউ কেউ।[২৯]

এছাড়া স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, মানবকুমারী বসু, কামিনী রায়, বিরাজমোহিনী দেবী, লজ্জাবতী বসু, প্রমীলা নাগ, বিনয়কুমারী বসু, নগেন্দ্র বালা মস্তাফি, পঙ্কজিনী বসু, নির্ঝারিণী দেবী, কৃষ্ণপ্রিয়া চৌধুরী, কুমুদিনী মিত্র প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। মহিলারা স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই বার্তাই বিশ্বাবাসীর কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিল যে, বাইরে জগতে তারাও পাশ্চাত্যের নারীদের মতোই ভূমিকা পালন করতে পারে।[৩০] অর্থাৎ নারীদের এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন সময়ে নারীরা যথেষ্ঠ এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছেন।

ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে নারীর ভোটাধিকারের দাবি ওঠে। ভোটাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সকল ধর্মের নারীরা ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। কংগ্রেস, মহাত্মা গান্ধী ও মুসলিম নারীরা ভোটাধিকারকে স্বাগত জানালেও পুরুষরা এর বিরোধীতা করে। এরপরেও

Dhaka University Institutional Repository

সরোজিনী নাইডু, মার্গারেট কাজিন্স, অ্যানি বেসান্ত, উমা নেহেরু, পণ্ডিত রমাবাই, অবলা বসু ও হযরত সোহানী প্রমুখ ভোটাধিকার দাবির নেতৃত্ব দিয়েছেন। নারীদের ভোটের অধিকারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আইন পরিষদে এ বিষয়ে ভোটাভোটি হয়। কিন্তু নারীদের ভোটাধিকারের দাবির বিপক্ষে ভোট পড়ায় তা বাতিল হয়ে যায়। এভাবে কয়েকবার আইন পরিষদে নারীদের দাবির বিপক্ষে ভোট পড়ায় তারা ভোটাধিকার লাভ করতে পারে না। তবে ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে ব্যাপক বিতর্ক হয়। ভোট একজন মানুষের অধিকার, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক। বর্হিঃবিশ্বে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করলেও বাংলায় নারীরা অনেক পরে এ অধিকার অর্জন করে। এমন কি এ ভোটাধিকার নিয়ে নারীদের মধ্যে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে এই ভোটাধিকাকে নারী জাতির উন্নতির পক্ষে সহায়ক বলে মনে করেন। এক আবেগময় ভাষায় সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক বলেন, "If we men Bengal, because we have the power in our hands, refuse to do justice to our own mothers, sisters and wives in the matter of their natural right to representation, then how could we legitimately expect a government coducted by foreigners, with no racial bond of attachment with us.....?"[৬৫]

১৯২১ সালে আইন পরিষদে নারীর ভোটাধিকার প্রশ্নটি উত্থাপিত হলে এ দাবির বিরুদ্ধে নারীরাও ভিন্ন মত প্রকাশ করে। 'অন্বেষা' পত্রিকায় সুফিয়া খাতুন বলেন, বর্তমানে নারীদের ভোটের অধিকারের দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে। মেয়েরা পুরুষদের ন্যায় ভোটাধিকার দাবি করেছে। স্বামীদের তো ভোটাধিকার আছে এবং আমরা তাদের পরামর্শ দেব তারা তাদের ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করুক। আমাদের বাইরে বেরিয়ে ভোটাধিকার আন্দোলনে অংশ নেওয়া ঠিক হবে না।[৬৬] নারীদের ভোটাধিকারের অন্যতম সমর্থক ইয়াকিমুদ্দিন আশঙ্কা করেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা পর্দা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলিম মহিলাদের ভোটাধিকারের বিরোধীতা করবে। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের বিপক্ষে এই বলে মন্তব্য করেন যে, নারীদের ভোটাধিকার দিলে তাদের মুখোমণ্ডল থেকে পর্দা খসে পড়বে এমনটা ভাববার কোন কারণ নেই। কেবল অভিজাত, শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিবান নারীদেরকেই ভোটাধিকার প্রদান করা সমীচিন।[৬৭]

ভোটাধিকারের প্রস্তাব মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে পাশ হয় ১৯২১ সালে, সংযুক্ত প্রদেশে ১৯২৩ সালে, সেন্ট্রাল প্রদেশে, বাংলা ও পাঞ্জাবে ১৯২৬ সালে। ১৯৩৫ সালে ভারতের নারী সমাজ ভোটের অধিকার লাভ করেন।[৬৮] ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির ফলশ্রুতি স্বরূপ কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে সম্মত হয় এবং মহিলা সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে সরোজিনী

Dhaka University Institutional Repository

নাইডু এতে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতের ৬০ লক্ষ নারীর ভোটাধিকারের আইন পাশ করে এবং ঐ বছরই প্রথম প্রাদেশিক পরিষদ ও সংসদে মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আইন অনুমোদিত হয়। এর ফলে প্রাদেশিক পরিষদের ১৫০ আসনের মধ্যে ৬ টি কেন্দ্রীয় সংসদে ২৫০ আসনের মধ্যে ৯ টি আসন মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।[৬৯]

স্বাধিকার আন্দোলনে নারী

বাংলার গণতান্ত্রিক নারী আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের যে ঐতিহ্য সংগঠনগুলো বহন করে আসছিল তাতে অচিরেই ফাটল ধরে। মুসলিম লীগের আহ্বানে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের আড়ালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ১০ নভেম্বর নোয়াখালীতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি দাঙ্গাবিরোধী কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। নিখিল ভারত নারী সম্মেলন ও মহিলা সমিতির সদস্যরা নোয়াখালী ও চাঁদপুরে দাঙ্গাবিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং ত্রাণকাজে নেমে পড়েন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগ হলে এই নারী আন্দোলনের উপর চরম আঘাত আসে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মুসলিম নারী লেখিকা খায়রুন্নেসা তাঁর স্বদেশচেতনামূলক লেখনীর মাধ্যমে বাংলার নারী সমাজকে স্বাদেশিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানান। ১৯০৫ সালে *নবনূর* পত্রিকায় 'স্বদেশানুরাগ' শিরোনামে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি মুসলিম নারীদের বিদেশী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মেয়েরা যদি দেশে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করে তবে দেশে অনেক কলকারাখানা গড়ে ওঠতে পারে। দেশে যে প্রচুর কর্পাস ও রেশম উৎপন্ন হয় তা দেশেই ব্যবহৃত হলে বিদেশীরা আমাদের ঘরের টাকা কোন মতেই জাহাজে ভরে সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজেদের দেশে নিয়ে যেতে পারবে না, আমাদের সর্বনাশ করতেও পারবে না। তিনি আরো বলেন, ''এস ভগ্নিগণ আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এই সমস্ত এনামেল হাত দিয়ে স্পর্শ করিব না। দেখি আমরা আমাদের দেশীয় কাঁসা পিতলের পুনঃপ্রচলন করিতে পারি কি না?"[৭০]

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আন্দোলন-বিক্ষোভ শুরু হলে নারীরা তাতে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়া তখন সামাজিকভাবেই বেশ গর্বের বিষয় হয়ে ওঠেছিল।[৭১] ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে বিপুল সংখ্যক নারী তাতে যোগ দেন। রেশমি চুড়ি ভেঙেগ ফেলা ও বিলিতি জামা-কাপড় পোড়ানোর ধুম পড়ে যায়। ঘরে ঘরে চরকা কাটা, খদ্দর পরা, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের মধ্যে বেশি সাড়া জাগায়।

Dhaka University Institutional Repository

অনেকে কারাবরণ করেন। এ আন্দোলনে যেসব নারীনেত্রী যুক্ত হন- তাঁরা হচ্ছেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মাতা বি-আম্মা (আবিদা বানু বেগম)। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করে গান্ধিজী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা প্রচার করেন। নারী সমাজকে এতে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। দেশের নারী সমাজকে তিনি তাঁদের সর্বস্ব ত্যাগ করে আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং সুতো কেটে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য আবেদন জানান।[৭২] তিনি ব্রিটিশ রাজ্যকে রাবণ রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, "সীতা কখনোই রাবণের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি, সেজন্য ভারতীয়রা কখনোই রাক্ষস সর্দার (ব্রিটিশ) এর সঙ্গে সহযোগিতা করবে না।"[৭৩] তিনি সভা-সমিতিতে নারীদেরকে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়ার জোর আহবান জানান। তিনি বলেন- নারীরা যেনো নিজেদের দেশের পণ্য ব্যবহার করে এবং বিদেশী পণ্য বর্জন করে। মূলত তিনি নারীদেরকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে জেগে ওঠার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আমন্ত্রণে তাঁদের বাৎসরিক সভায় পুত্রদের প্রতিনিধিস্বরূপে বি-আম্মা যোগ দেন। কংগ্রেসের এই সভায় সভানেত্রী ছিলেন সদ্য কারামুক্ত এ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু। বি-আম্মা এ সভায় বলেন," দেশ মাতৃকার মুক্তি জন্য প্রয়োজন হলে স্বামী-পুত্রদের পাঠাতে হবে জেলে এবং নিজেদেরও ভয়-দ্বিধা পরিত্যাগ করে, বরণ করে নিতে হবে কারাগার। আমার সন্তানেরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছে। সেজন্য জননী হিসেবে আমি গর্ববোধ করি।"[৭৪]

১৯৩০ সালে গান্ধিজীর লবন সত্যাগ্রহ বা ডাণ্ডি মার্চের সময়ও দলে দলে মহিলারা এতে যোগ দিতে থাকেন। এই আন্দোলনে যেসব মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন- সরোজিনী নাইডু, মোহিনী দেবী, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি, নেলি সেনগুপ্ত, উর্মিলা দেবী, বাসন্তী দেবী, বিমল প্রতিভা দেবী, নির্ঝরিণী সরকার, আশালতা সেন প্রমুখ।[৭৫] নারীনেত্রী জোবেদা খাতুন (১৯০১-১৯৮৬) আইন অমান্য আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। ১৯২২ সালে সিলেটে সর্বপ্রথম নারীদের জন্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহাত্মাগান্ধী, শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি (জোবেদা খাতুন) সেখানে দোভাষী দায়িত্ব পালন করেন। সিলেটের প্রকাশ্য এই জনসভা জোবেদার রাজনৈতিক সচেতনতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের 'মহিলা শ্রীহট্ট সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং জোবেদা এর সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর বিশের দশক থেকে গড়ে ওঠতে থাকে বিপ্লববাদী সংগঠন। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- অনুশীলন পার্টি, যুগান্তার পার্টি, বেঙ্গাল ভলান্টিয়ার্স, চট্টগ্রাম বিপ্লবী সমিতি, পাঞ্জাব সদর পার্টি, ভারতীয় বিপ্লবী দল প্রভৃতি। এই বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিদেশিনী মহিলা মাদাম কামারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এই আন্দোলন বাংলায় বেশি জোরদার ছিল। "কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের জন্য ১৯৩২ সালে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সের সময় কল্পনা এই সশস্ত্র অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তারপর ধরা পড়েন এবং যাবজ্জীবন কারাগারে দণ্ডিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তার নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"[৭৬]

চট্টগ্রামের অস্ত্রগার আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নারী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। "প্রীতির শুধু জ্বলন্ত দেশপ্রেমই ছিলনা, তিনি ছিলেন স্কুলের সবচাইতে ভাল ও মেধাবী মেয়ে। তাঁর আদর্শ ছিল সন্ত্রাসবাদের ভিতর দিয়ে দেশকে স্বাধীন করা। ১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য যে সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল প্রীতি সেই বিপ্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পুলিশের গুলীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সংগ্রাম করেন এবং অবশেষে সেই গুলিতে নিহত হন।"[৭৭] এছাড়াও শান্তি শুধা ঘোষ, লীলা নাগ, বীণা দাস, কমলা দাসগুপ্ত, লতিকা সেন, প্রমুখ ব্রিটিশ সমাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের জন্য সংগ্রাম করেছেন। সরলাদেবী বৃটিশ সম্রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মহিলা এম. এ। তিনি ছিলেন ভারতের নারী আন্দোলনে সবার পুরোভাগে। এডউইন মন্টেগু যখন সচিব, সেসময় তিনি একটি নারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দান করেন। এছাড়া তিনি ভোটাধিকার দানের ক্ষেত্রে যে ঘোরতর অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। প্রধানত তাঁর প্রচেষ্টায় নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বাধীনতার ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরবাঈ মখনজি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের রোষদৃষ্টিতে পড়ে তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়েছে। "স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকজন মুসলিম নারী বেগম শাহনওয়াজ। পার্লামেন্টরী রাজনীতিতে একমাত্র সরোজিনী নাইডু ছাড়া সমগ্র পাক-ভারতে আর কোন মহিলার সাথে বেগম শাহনওয়াজের তুলনা হয় না। ১৯১৭ সালে ইনি নিখিল ভারত মুসলিম নারী সম্মেলন আহ্বান করে মুসলমান মেয়েদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আলোচনা করেন।"[৭৮] তাঁর সমাজিক ও রাজনেতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯৩১ সালে বিলাতে

Dhaka University Institutional Repository

গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৩৩ সালের গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ছিলেন একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি।

নারী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা রোকেয়া সাখায়াত হোসেন প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ না নিলেও পরোক্ষভাবে স্বাধীনতাকে আন্দোলনে সমর্থন করেন। তিনি বিভিন্ন রচনায় স্বাদেশিকতার আদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (১৯০৬) প্রভৃতি ঘটনা রাজনীতিকে উত্তপ্ত করলেও, বেগম রোকেয়ার কোন আগ্রহ ছিল না। তবে তাঁর ভীষণ রকম ঘৃণা ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পদলেহন আর স্বদেশের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর।

রোকেয়ার স্বাদেশি ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় *নিরূপম বীর* নামক কবিতায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিপ্লবী কানাইলাল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ করলে ইংরেজরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। রোকেয়া তাঁর এই কবিতায় বীর কানাইলালের কার্যকলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[৭৯] ১৯০৭ সালে কংগ্রেসের চরমপন্থী গোষ্ঠী কংগ্রেসের নরমপন্থীদের আবেদন-নিবেদন নীতির তীব্র বিরোধিতা করে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। রোকেয়া *মুক্তিফল* নামক রুপকথায় এ বিষয়টা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন।

১৯২১-১৯২২ সালে অসহযোগের সময় বেগম রোকেয়া *চাষার দুঃখ* ও *এণ্ডিশিল্প* নামক প্রবন্ধ লেখেন। এতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের সীমাহীন শোষণে কৃষকরা কত দুর্ভোগের মধ্যে আছে তা ব্যক্ত করেন। আপাতসুলভ রঙিন ও মিহিকাপড়ের মোহে হাতে প্রস্তুত বস্ত্রাদির প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে রোকেয়া নিন্দা করেন। সাথে সাথে রংপুরের বিলুপ্ত প্রায় এন্ডিশিল্পকে পুনরুজ্জীবনের ওপর জোর দেন। তিনি গুটিপোকা সংগ্রহ, প্রক্রিয়া জাতকরণ এবং চরকায় সুতো তৈরির জন্য আবেদন রাখেন।[৮০] তিনি মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলেনের চেয়ে কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বেশি গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টীয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথম ভারতবাসী তারপর মুসলমানব, শিখ বা আর কিছু।"[৮১]

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সরাসরি সংগ্রামে না থাকলেও রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে আলাদা ছিলেন না। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশেন বি-আম্মা ও এ্যানি বেসান্তের আগমন উপলক্ষে গঠিত স্বেচ্ছাসেবিকা সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম স্বদেশি ও খিলাফত আন্দোলনে যথেষ্ঠ সহয়তা করে কমলা দাসগুপ্ত রোকয়াকে বিপ্লবী নেত্রীরূপে অভিহিত করে বলেন যে, তিনি বাংলা ও বিহারের অবরোধবাসিনী মহিলাদের জীবনের বেদনাতুর চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হানাবার জন্য প্রেরণা জাগিয়েছেন- এ দিক থেকে তিনি বিপ্লবী। প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান না করলেও অনগ্রসর সমাজের নারীদের মধ্যে দেশানুরাগ জাগাবার যে প্রচেষ্ঠা তিনি সারা জীবন ধরে করে গেছেন তার মূল্য কম নয়।

উনিশ শতকে নারীদের অগ্রগতিতে অন্যতম ভূমিকা রাখেন ফয়জুন্নেসা চৌধুরানি। তিনি ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা নওয়াব। সমাজ সংস্কারের অংশ হিসাবে তিনি মেয়েদের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। ১৮৭৩ সালে (বেগম রোকেয়ার জন্মের সাত বছর পূর্বেই) নারী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে তিনি কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। উপমহাদেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের প্রাচীন স্কুলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। "কুমিল্লা শহরে মেয়েদের জন্য তিনি পৃথকভাবে দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৭৩ সালে একটি কুমিল্লার নানুয়া দিঘির পাড়ে, অন্যটি কান্দির পাড়ে। কান্দির পাড়ের বিদ্যালয়টি ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

মেয়েদের শিক্ষায় ফয়জুন্নেসার অবদান সম্পর্কে মজির উদ্দিন সাহেব বলেন, "... ইতিহাসের এমনি এক দুর্যোগময় অন্ধকার যুগে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানি দুর্ভেদ্য পর্দার অবরুদ্ধ প্রাচীর ভেদ করে অন্দরমহলে ইংরেজি ঢোকাবার উদ্দেশ্যে দুর্দম সাহস নিয়ে মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ সালে কুমিল্লায় নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করেন ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।"[৮২] জে.ই ওয়েব স্টার কতৃক প্রকাশিত গেজেটিয়ার থেকে জানা যায় যে, "There were 1908-09, one middle vernacular & upper primary and 628 lower primary girls schools, besides 17 schools teaching the Koran only."[৮৩] ১৮৮৯ সালে এই স্কুলটিকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত পর্যন্ত করা হয়। পরবর্তীকালে সরকারিকরণের মাধ্যমে ফয়জুন্নেসা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নামকরণ করা হয়। সম্প্রতিকালে ১৯৯৯ সালে এই বিদ্যালয়ের নাম নবাব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় করা হয়। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটি ছিল অনন্য। তাঁর কন্যা বদরুন্নেছা পশ্চিমগাঁওয়ে নওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মেয়েদের হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারির আয় থেকে মেয়েদের জন্য নির্মিত এ হোস্টেলের সব খরচ বহন করা হতো। এখানে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

মুসলিম নারী শিক্ষায় ফয়জুন্নেসার অবদান প্রসঙ্গে ওয়াকিল আহমদ বলেন, "মুসলমান নারীদের শিক্ষার অগ্রদূত নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরানী ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ঐ সময় কলিকাতাতেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ছিল না। মুসলমান মেয়েদের ব্যাপারে ফয়জুন্নেসার পরেই ঢাকার সুহৃদ সম্মিলনীর স্থান।"[৮৪]

নিম্নে ১৮৮১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কলকাতার নারী শিক্ষার পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো :

ধর্মের নাম	১৮৯১ সাল	১৯০১ সাল
হিন্দু	৭%	৯%
মুসলিম	১%	৩%
খ্রিষ্টান	৭০%	৭০%
ব্রাক্ষণ	৬৫%	৫৩%
বৌদ্ধ	২৫%	১৫%

নারী শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য উনবিংশ শতকের শেষ দশকে বাংলায় পবিত্র কোরান শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রী সংখ্যা তালিকা নিম্নের ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

সাল	পবিত্র কোরান স্কুল	ছাত্রী সংখ্যা
১৮৯১-৯২	৪	৪৬
১৮৯৭	১১	১৪২
১৯০২	১৫	১৭৫
১৯০৭	১৭	২৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, পুরো বাংলায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নারী শিক্ষা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। সেখানকার সরকার ও পুরুষ সমাজ নারীশিক্ষার জন্য এগিয়ে আসার প্রযোজনবোধ করেনি। সেখানে ফয়জুন্নেসা সমাজের গলদটা অনুধাবন করে নারীদের জন্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উপরের আলোচনায় এই বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার সমাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটি নতুন স্পন্দন দেখা দিয়েছিল। তৎকালীন মানুষের চিন্তা-চেতনায়, একটি পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। এজন্য এসময়কে নবজাগরণের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। স্বপন বসু এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, "উনিশ শতকের বাংলায় নতুন যুগের এবং সেইসূত্রে আধুনিকতার সূত্রপাত একথা মোটামুটি স্বীকৃত। এই নতুন যুগকে আমরা বিশেষভাবে বলতে চাই নবজিজ্ঞাসার যুগ। উনিশ শতকে ভারতীয় ঐতিহ্য ও ইউরোপীয় সভ্যতা- প্রায় পরস্পর বিরোধী এই দুই ধারার সম্মুখীন হয়ে এদেশের মুষ্টিমেয় 'সচেতন' জনমনে এই জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এ জিজ্ঞাসা সচেতন বাঙ্গালীর আত্মজিজ্ঞাসা এবং তা প্রসারিত হয়েছে প্রচলিত ধর্ম, সমাজ, রীতিনীতি ও রাজনৈতিক দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে।"[৮৫] ব্রিটিশ শাসনে খুবই অল্প পরিসরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবর্ষের নাগরিক জীবনে জিজ্ঞাসা, আলোচনা-সমালোচনা, বিচার-বিতর্কের মনোভাব জাগিয়ে তোলে। যা বাংলার অচল সামন্তবাদী সমাজ ও সনাতন রীতি সম্পর্কে সংশয় ও অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে। আর সেটি খুব ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও আধুনিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পলাশী পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এক অশুভযাত্রা শুরু হয়। ইংরেজদের দায়িত্বহীন শাসনে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। প্রায় ১৫০ বছর শিক্ষার দিকে নজর না দেয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে সমাজ ও দেশ ছেঁয়ে যায়। এ অবস্থায় সমাজ সংস্কারকগণ নারীদের অন্ধকার থেকে বের করার চেষ্টা করেন। নারীরা শিক্ষার আলো পেয়ে সামনের এগিয়ে আসতে থাকেন। তাদের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন আসতে থাকে। স্বাধীন পেশা হিসেবে তারা ধাত্রীবিদ্যা, চিকিৎসা, শিক্ষকতা গ্রহণ করতে থাকেন। নিজেদের দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করতে আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের ফলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় থেকে রেহাই পেয়ে নারীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে থাকে। মুসলিম সমাজের নারীদের অসহনীয় পর্দার বেড়াঁজাল থেকে রক্ষার জন্য সমাজ-সংস্কারকগণ, কবি-সহিত্যিকগণ ও সচেতন জনগণ নানান ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। আধুনিক শিক্ষা ও সচেতনতার

Dhaka University Institutional Repository

কারণে পুরুষেরা অনুধাবন করে যে, নারী-পুরুষের শিক্ষায় কোন ভেদাভেদ নেই। এই সময় নবাব ফয়জুন্নেসা, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, স্বর্ণ কুমারী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী, সারদা দেবী প্রমুখ নারীরা বাহিরের জগতের সাথে সাধারণ নারীদের মেলবন্ধন তৈরি করার জন্য সংগঠন গড়ে তোলোর প্রযোজনীয়তা অনুভব করেন। তারা নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্নভাবে কাজ করতে থাকেন। নারীরা দীর্ঘদিন ধরে ভোটাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার পর ১৯৩৫ সালে ভোটের অধিকার লাভ করেন। এ অর্জন ছিল নারীদের জন্য একটি মাইলফলক বিষয়। স্বাধিকার আন্দোলনের চেতনায় নারীরা উজ্জীবিত হয়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতে থাকেন। এতে আবিদা বানু বেগম (মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর মা), সরোজিনী নাইডু, মোহিনী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, আশালতা প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ নারীসমাজের মাঝে আশার আলো জাগাতে থাকেন। বিপ্লবী নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত তৎকালীন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগারে আক্রমণ করে বাংলার ইতিহাসের গতিধারায় নারীদের জন্য আলাদা অবস্থান তৈরি করেন। এভাবে নারীরা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সংগ্রাম করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলার নারী সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন পর্যায়ক্রমে গতিশীল হয় এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. আনোয়ার হোসেন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ঃ ১৮৭৩-১৯৪৭*, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৪০

২. Mary Wollestonecraft, *Vindication of the Rights of women*, London, 1955, p.29

৩. C. D. M. Ketelbey, *A History of Modern Times from 1789*, Oxford University Press, London, 1932, p. 55-58

৪. Kanak Mukherjee, *Women's Emancipation Movement in India*, National Book Centre, New Delhi, 1989, p.10

৫. Ibid, p.18

৬. গীতশ্রী বন্দনা সেনগুপ্ত, *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬

৭. O'Malley, L.L.S (ed.), *Modern India West*, Oxford University press, London, 1968, p. 445

৮. সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, অর্পনা বুক ড্রিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৩১

৯. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩২

১০. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩২

১১. মল্লিকা ব্যানার্জী, 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে দুই- একটি ভাবনা", সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত) *ইতিহাসে নারী: শিক্ষা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৪৩

১২. সুনীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৭৮

১৩. Anup Taneja, *Gandhi, Women and the National Movement, 1920-47,* Har-Anand Publications, Delhi, 2005, p.23

১৪. Ibid, p. 23

১৫. কনক মুখোপাধ্যায়, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২১

১৬. গোলাম মুরশিদ, *নারী প্রগতি: আধুনিকতার অীভঘাতে বঙ্গরমনী*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ২১

১৭. শ্রী প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলায় নারী জাগরণ*, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭

১৮. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

১৯. নুরুল ইসলাম মনজুর, *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ*, সমতট প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ২০০৬, পৃ. ৭৫

২০. সুধীর কুমার মিত্র, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, মিত্রানী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ১৯২

২১. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৯৭

২২. বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত* (প্রথম খণ্ড), বাক সাহিত্য প্রা লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ২৬৭

২৩. S.N. Mukherjee, "Raja Rammohonan Roy and the status of women in Bengal in The Nineteenth century," *Women in India and Nepal*, Michale Allen and S.N. Mukherjee *(ed.)*, Australian Naitonal University, Canberra, 1982, p. 165

২৪. মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, *বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার*, যশোহর, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮০

২৫. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯০ পৃ. ১৪১-১৪৩

২৬. নৌসের আলী খান ইউসুফজাই, *বঙ্গালী মুসলমান*, হিন্দুপ্রেস, ঢাকা, ১২৯৭, পৃ. ৩৪

২৭. আব্দুল ফজল, ফাতেমা খানমের 'সপ্তর্ষি'র মুখবন্ধ, বুলবুল পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৬৪ পৃ. vii (উদ্বৃত) মোনিয়া নিশাত আমিন, *প্রাগুপ্ত*, ৪৩

২৮. শেখ জমিউদ্দিন, *স্ত্রী জাতির ভীষণ অত্যাচার*, ইসলাম প্রচারক, ১৩১০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৮১-১৮৫

২৯. কাজী ইমদাদুল হক, *বহুবিবাহ*, নবনূর, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৪৩।

৩০. এস. ওয়াজেদ আলি, *মোসলেম নারী*, ঢাকা, পৃ. ৭২

৩১. ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, "বিবাহনীতি" *আল ইসলাম*, ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৬

৩২. *মাসিক মোহাম্মদী*, "বিবাহের বয়স নির্ধরণ", সম্পাদক, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৫

৩৩. *মোয়াজ্জেন*, কার্তিক, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

৩৪. *এস.ওয়াজেদ আলী রচনাবলী*, "অভিভাষণ", প্রাগুপ্ত, পৃ. ৫৩৪

৩৫. *আল ইসলাম*, আশ্বিন, ১৩২৬।

৩৬. ছিদ্দিক আহমদ রামপুরী, "বাল্যবিবাহের পরিণাম", *আল ইসলাম*, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

৩৭. *ইসলাম প্রচারক*, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩, পৃ. ৮৮

৩৮. *মাসিক মোহাম্মদী*, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

৩৯. *সাওগাত*, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৪০. *সাওগাত*, ৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৬

৪১. ডা: আব্দুল মালেক, ''অবরোধ প্রথার অপকারিতা", *মাসিক মোহাম্মদী*, ফাল্গুন, ১৩৩৫

৪২. *এস. ওয়াজেদ আলীর রচনাবলী*, "তুর্কি হানুস", ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯০

৪৩. আব্দুল হোসেন, *আদেশের নিগ্রহ*, শান্তি, আশ্বিন, ১৩৩৬, পৃ.৭১

৪৪. বিনয় ঘোষ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৫৩

৪৫. Judith E. Walsh, *Domesticity in coloncial India* : What women learned When Men Gave them Advice, Oxford University Press, New Delhi, 2004, p.2

৪৬. Premnath Banerjee (ed), *Hundred years of the University of Calcutta*, Calcutta, 1957, p.121

৪৭. Syed Nurullah and J.P.Naik, *History of Education in India during in British period*, Bombay, India, 1943, p. 21.

৪৮. Y.B.Mathur, *Women's Education in India, 1813-1966*, Asia publishing, Bombay, India, 1973, p. 25.

৪৯. ১৮৮২-৮৩ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট, উদ্বৃত, Usha Sharma and B.N Sharma(ed.), *Women Education in Modern India*, Commomwealth publishers, New Delhi,1995, p.73.

৫০. Ibid, p.73.

৫১. Ibid, p.73

৫২. *Progress of Education in India:1887-88 to 1891-92*, Second Quinquennial Review, Office of the Superintendent Government printing, Calcutta, 1893, p.277.

৫৩. *ই.সি.বেইরি রিপোর্ট*, জুন ২২, ১৮৬৭

৫৪. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ. ২২

৫৫. আব্দুর রহমান, "শিক্ষার ভিত্তি", *আল-ইসলাম*, কার্তিক ১৩২৬, পৃ. ৩৯০

৫৬. নুরুন্নেসা খাতুন, "নারীজাতির শিক্ষা", *সাওগাত*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, পৃ. ৫২১-২২

৫৭. রহিমা খানম মিলকি, "মুসলিম নারীশিক্ষা পদ্ধতি", *সাওগাত*, মাঘ ১৩৩৪, পৃ. ৬৮১

৫৮. বেগম ফতেমা লোহানী, "নারীসমাজের কর্তব্য ", *সওগাত*, ভাদ্র, ১৩৩৪, পৃ. ২৭৪-৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. তাহেরুদ্দিন আহমেদ, " স্ত্রীশিক্ষা ", *সাওগাত*, কার্তিক ১৩৩৪, পৃ. ৪৫১-৫৩

৬০. The Moslem Chronilc, 23 January 1987, P. 29

৬১. j. Murdoch, Twelve Years of Indian progress, Extracted from the Indian National Congress, the Resolutions of its Thirteen Session, Madras, India, 1889, p.86

৬২. Kanak Mukherjee, Ibid, p.44

৬৩. Sumit Sarkar, *The Swadeshi Movement in Bengal*, peoples Publishing House, New Delhi, 1977, p. 287-288

৬৪. Aparna Basu, "The Role of Woman in the Indian struggle for Freedom", "*in Indian women: From Purdah to Modernity*, (ed.) B.R. Nanda, vikas Publishing, New Delhi, 1976, p.17

৬৫. Bengal Legislative Council Proceedings, Vol.iv, 2.9.1921, pp.383-384

৬৬. সুফিয়া খাতুন, "নারীর অধিকার", *অন্বেষা*, প্রথমবর্ষ, কার্তিক, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

৬৭. Bengal Legislative Council Proceedings, Vol.iv, 2.9.1921, pp. 341-343

৬৮. Geralding Forbes,Women in Modern India, Cambridge University Press, New Delhi, 1996, p.101

৬৯. মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ . ৭৭

৭০. খায়রুন্নেসা, "স্বদেশনুরাগ", *নবনূর*, তৃতীয় বর্ষ, সংখ্যা-৬, ১৩১২, বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৭৭-২৮৯

৭১. কনক মুখ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

৭২. Gandhi, "Speech at meeting of Muslim Women", *Collected Works of Mahatma Gandhi,* Vol- XX, p. 397

৭৩. *Navajiban*, 28 November, 1920

৭৪. এম. আব্দুর রহমান, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা*, প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩১

৭৫. কনক মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩

৭৬. মালেকা বেগম, *নির্বাচিত বেগম, অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৩৯

৭৭. মালেকা বেগম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৯

৭৮. মালেকা বেগম, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৭৯. আব্দুর কাদির (সম্পাদিত) *রোকেয়া রচনাবলী*, "নিরুপম বীর", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৮৯-২২০

৮০. "চাষার দুঃখ" ও "এন্ডিশিল্প", প্রাগুপ্ত, পৃ. ২৩৭-২৩৯

৮১. "সুগৃহিনী", প্রাগুপ্ত, পৃ. ৪৫

৮২. এ.এইচ.এম মহিউদ্দিন, ফয়জুন্নেছার জীবন আলেখ্য, রূপজালাল শতবকার্ষিকী স্মরণী, কুমিল্লা, ১৯৭৭, পৃ. ১২

৮৩. Webster.J.E : East Bengal District Gazetteers, Tippera, Calcutta, 1919, p. 106

৮৪. ওয়াকিল আহমেদ, উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৪৯৯

৮৫. স্বপন বসু, বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে রাজনৈতিক আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ

ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশ দীর্ঘ সময় ধরে শাসন করেছে। এ দীর্ঘ সময়ে মানুষ ব্রিটিশদের শাসন ব্যবস্থা থেকে মুক্তি চেয়েছে। কিন্তু শাসকরা শাসনক্ষমতা থেকে সরে যায়নি। অবশেষে এই বেনিয়াদের যাঁতাকল থেকে ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ও ১৫ আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় । এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতবর্ষের বহুস্থান থেকে অগণিত মানুষ জীবনোৎসর্গ করেছেন। এই স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-পুরুষ উভয়ই অংশগ্রহণ করেছেন। খোকা রায় বলেন, "১৯৪৭ সালের আগস্টের আগ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মসূচিতে যেমন ছিল ব্রিটিশ রাজ্যে শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির পথনির্দেশ; তেমনি শ্রমিক, কৃষক বা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সংকট দূর করা, বেকারত্ব দূর করা, নারীর সামাজিক নিপীড়ন বন্ধ করা, পারিবারিক আইনের সংস্কার করা ইত্যাদি বিষয়েও দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। আগস্টের মাঝামাঝিতে দেশভাগ হয়ে ব্রিটিশের শাসন-শোষণ বন্ধ হলেও নতুন শাসকগোষ্টীর শাসন-শোষণের দমননীতি শুরু হলো। মানুষের জীবনের অন্যান্য সংকট দূর হলো না। উপরন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হলো। সে দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল, নিঃস্ব হয়েছিল লাখ লাখ মানুষ এবং অগণিত নারী লাঞ্ছিত হয়েছিল, সম্ভ্রম হারিয়েছিল।"[১] রেণু চক্রবর্তী বলেন, "হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পাকিস্তানে এবং মুসলমানরা ভারতে অশেষ দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনার শিকার হলো। চলতে লাগলো দেশ ত্যাগ। ..... এই চরম সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি প্রতিরোধে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন। মুসলিম লীগের মুখ্যমন্ত্রী শহীদ সোহওয়ার্দী তার সাথে দেখা করলেন। মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগে "শান্তিসেনা" নামে একটি শান্তি দল গঠিত হলো; বহু মেয়ে সেই দল যোগ দিল।"[২] এ থেকে অনুমান করা যায় যে, স্বাধীনতাত্তোর যুগে নারীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বর্তমান অধ্যায়ে নারীর রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে।

রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাধারণ নাগরিকরাও হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ থেকে মুক্ত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশেষ করে দুই ধর্মের নারীরা নিজস্ব উদ্যোগে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরি করেন। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কলকাতায় হিন্দু মেয়েরা পূজায় মুসলিম মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে এবং মুসলিম মেয়েরা ঈদে হিন্দু মেয়েদের আমন্ত্রণ জানায়। এভাবে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর চেষ্টা চলে।[৩] মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ডে

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকজন রাজনীতিবিদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও হতাশা জেগেছিল। তৎকালীন প্রথম মুসলিম বাঙ্গালী মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী এক সাক্ষাতকারে বলেন, "কংগ্রেস ত্যাগ করি ১৯৩৫ সালে। দীর্ঘদিন সমাজসেবামূলক কাজ করার পর ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগে যোগ দেই। তখন মনে হয়েছিল পাকিস্তান হলে আমরা শিক্ষা ও সম্পদে হিন্দুদের সমকক্ষ হতে পারব। পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে মেয়েরা যদি ভোট না দিতেন তবে পাকিস্তান হতো না। পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্যে সফল হবে না।" [৪] দেশ ভাগ হওয়ার পর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির স্ত্রীরা বা মহিলারা মুসলিম লীগের নেত্রীরা (ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন), তারা রিফিউজিদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। ১৯৪৮ সালে লিয়াকত আলী খানের স্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের তরুণীরা প্রাথমিক চিকিৎসা, ত্রাণপুনর্বাসন ব্যবস্থা ও রিফিউজি নারী ও শিশুদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন।

পাকিস্তানের নারী সমাজকে সামাজিক কাজে একত্রিত করার জন্য বেগম রানা লিয়াকত আলী খান একটি সম্মেলন ডাকেন। এই সম্মেলনে ১০০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের নিয়ে 'আপওয়া' সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই সংগঠনে ১৬ বছর বয়েসের বড় মেয়েরা অংশগ্রহণ করবে। এর মাধ্যমে তারা অন্যান্য অসচেতন নারীদেরকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাসহ নানা ধরণের কাজে অংশগ্রহণ করাবে এবং সচেতন করে গড়ে তুলবে। তবে এই সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য ছিলেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রীরা। একটি সরকারি প্রশাসনিক পরিকাঠামোর মধ্যে দ্রুতই এই সংগঠনের প্রসার ঘটে। কিন্তু লীগ সরকারের অনুমোদনের মধ্যে নিছক সমাজসেবামূলক কাজই করতে হতো বলে প্রচুর সীমাবদ্ধতা নিয়ে এই সংগঠনটি একই বৃত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।[৫] পূর্বপাকিস্তানেও আপওয়ার শাখার শুভ সূচনা করেন বেগম লিয়াকত আলী খান। আপওয়ার পূর্ব পাকিস্তান শাখার প্রথম সভানেত্রী ছিলেন বেগম নুরুল আমীন খান (প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীনের স্ত্রী) ও সভানেত্রী ছিলেন শামসুন্নাহার মাহমুদ। পরবর্তীকালে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ পূর্ব পাকিস্তান শাখার সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৬]

এ সংগঠনের কার্যকলাপকে সরকার নিয়ন্ত্রণ করত। সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত হত বলে এই সংগঠনকে সরকারি নির্দেশ পালন করতে হতো। ১৯৫০ সালে গভর্নর হাউজে নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতির সভা হয়েছিল। আপওয়া সংগঠনটি নারীদের নারীরা উন্নয়নের কথা বলতেন

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেসব বাস্তবায়নের চেষ্টা করতেন। যদিও তারা সরকারের সকল নীতির সাথে আপোষ করতেন না। 'আপওয়া' প্রসেঙ্গে জোবেদা খাতুন চৌধুরী বলেছেন, "আপওয়া গঠিত হয়েছিল দেশ পুনর্গঠনে মহিলাদের অংশগ্রহণের জন্য। বেসরকারি মহিলারা এই সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করুক বা দায়িত্ব পালন করুক সেটা ঊর্ধ্বতন অফিসাররা চাইতেন না। তারা (ডিসি, এসপি) চাইতেন তাদের স্ত্রীরা সভানেত্রী হবেন। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলাম। ১৯৫৪ সালে লাহোরের আপওয়ার সম্মেলনে আমি সিলেটের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেই। এই সম্মেলন থেকে বুঝতে পেরেছিলাম বাঙ্গালীদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি নেত্রীবৃন্দের মনোভাব কতোটুকু বিরূপ।"[৭] এ থেকে বোঝা যায় সরকারি প্রতিনিধিরা বেসরকারি জনগণের সাথে কিরূপ ব্যবহার করত। সরকারি গণ্ডির বাইরে যেয়ে নারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল না। এজন্য অনেক নারী এ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে আসেন। এখানকার অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন সচ্ছল, উচ্চবিত্তের পরিবারের। এজন্য তারা সাধারণ জনগণ থেকে দূরে ছিলেন। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং, চরকার সুতা কাটা, দুর্গতদের সাহায্যসহ বহুমুখী কাজ করা হতো। তবে সবার জন্য সরকারি গণ্ডি উন্মুক্ত ছিল না। বেসরকারি পর্যায়ে কেউ কেউ এগিয়ে আসলেও তারা সরকারের সহযোগিতা খুব একটা পাননি। তাই বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তখন নারীরা সীমিত পরিসরেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের নারী আন্দোলনের উপর সরকারের চাপ প্রয়োগ

পূর্ব-পাকিস্তানে সরকারি মহিলা সমিতি ছাড়াও বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন গড়ে ওঠে। সুফিয়া কামাল ১৯৪৭ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। এসময় লীলা রায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী) তিনি সুফিয়া কামালের সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে ঢাকায় বাসা ঠিক করে দেন। তখন লীলা রায় সুফিয়া কামালকে ঢাকায় সংগঠনের কাজে যুক্ত করেন। লীলা রায় *দেশ ছেড়ে যাবো না* আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। লীলা রায়ের উদ্যোগে বেগম সুফিয়া কামাল, মিসেস মোতাহার হোসেন, মিসেস মানিক ঘোষ, রহিমুন্নেসা (মিসেস রাজ্জাক), মিসেস রশীদ, মিসেস বেগ এঁরা একত্রিত হয়ে পায়ে হেঁটে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে 'ওয়ারী মহিলা সমিতি' গড়ে তোলেন। ১৯২৭ সালে নারীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় 'কল্যাণ কুঠির আশ্রম' ও 'গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি'। ১৯৩২ সালে 'কল্যাণ কুঠির আশ্রম' বেআইনি ঘোষিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আশালতা সেন সেটি আবার গড়ে তুলেন।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব-পাকিস্তানে মহিলা সমিতি গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলার প্রগতিশীল মহিলানেত্রী ও কর্মীদের নিয়ে ময়মনসিংহ শহরে সম্মেলন করা হয়। কমিউনিস্ট মহিলা কর্মী যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা নাগ, পূর্ণিমা বকশী, রানী চক্রবর্তী, মজিরা খাতুন, মনোরামা বসু, হেনা দাস, ভানু দেবী, অর্পনা এরাই ছিলেন উদ্যোক্তা। সাধারণ সচেতন নারীদের কাছে এই সংগঠন বেশ আশার আলো দেখিয়েছিল। যার ফলে বহু নারী এই সংগঠনে যোগ দেন। ১৯৪৮ সালে বেগম সুফিয়া কামালকে সভানেত্রী ও যুঁইফুল রায়, নিবেদিতা নাগকে যুগ্ম সম্পাদক করে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি ' গঠন করা হয়। ঢাকা জেলার নারীদেরকে নিয়ে এ সমিতি একটি সম্মেলন করে। সরকার প্রথমদিকে এই সমিতির কর্মকাণ্ডকে সুনজরে দেখলেও পরবর্তীতে এর বিরুদ্ধে লেগে যায়। এই সংগঠনের নারীরা একদিন প্রোগ্রাম শেষে বাড়ি ফিরে আসার পথে বিশেষ করে- যুঁইফুল রায়, পূর্ণিমা বকশী, মজিরা খাতুন দুবৃত্তদের আক্রমণের শিকার হন। সরকারি মদদে ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে সমিতির উপর আক্রমন চালানো হয়। ঢাকা শহরের বাজার দেউড়িতে কিছুদিনের জন্য এর অফিস খুলে রাখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে রাজবন্দিদের দাবি-দাওয়া সমর্থন করতে গিয়ে নারী নেত্রীরা গ্রেফতার হন এবং সমিতির কাজ বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

এসময় নারীরা মুসলীম লীগের সকল কাজে বিরোধীতা করেন তখন সিলেটে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সাথে মহিলা সমিতিও যোগ দিয়েছিল। 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি' কৃষক পরিবারের মহিলাদেরকেও সংগঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল। কালীই বিবি নামের নানকার বধূ ছিলেন নানকার আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী। প্রখ্যাত নারীনেত্রী হেনা দাস এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। জেলা প্রশাসকের কাছে অভাব অভিযোগ জানিয়ে কৃষকদের দাবিনামা পেশ করতে গেলে কৃষক রমণীদের সঙ্গে মহিলা সমিতির সদস্য অর্পনা পাল, গৌহাটি হেলথ ভিজিটর সুষমা ও কলেজ ছাত্রী অমিতা তাতে যুক্ত হন। সরকারি বাহিনী তখন নিরস্ত্র এসব কৃষকের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়। এতে বহু কৃষক মারা যায়। উল্লেখ্য যে, সুষমাকে পুলিশ বুটের আঘাত করে পেটের সন্তান মেরে ফেলে। সুষমা ও অমিতাকে অত্যাচার করে অজ্ঞান করে ফেলে। এরপর তাদের জেলে বন্দি করে রাখা হয়।[১০] ১৯৪৮ সালের দিকে চাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় এ সমিতির সদস্যরা মিছিল বের করেন। এই মিছিলের নেতৃত্বে দেন মনোরমা বসু। তিনি ক্ষুধার্ত বুভুক্ষ মেয়েদের মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যান। নারীদের সাথে জনসাধারণও এ মিছিলে যোগ দেয়। পুলিশ খাদ্যের দাবিতে মিছিলরত নারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। বহু নারী এতে আহত হন। মনোরমা বসুসহ চারজন নেত্রী ও আটজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকমাস হাজত বাসের পর এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। পরবর্তীতে সকলকে ছেড়ে দিলেও সরকার মনোরমা বসুকে নিরাপত্তা আইনে আটকে রাখে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত।[১১]

ঢাকা, রাজশাহী ও সিলেটের কারাগারে রাজনৈতিক বন্দিদের মধ্যে নারীরাও ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মহিলা সমিতির নেত্রী নিবেদিতা নাগের নেতৃত্বে মহিলা সমাজের প্রতিনিধি দল অনশনরত ধর্মঘটে রাজবন্দির মুক্তির জন্য সরকারের কাছে দাবি জানায়। সরকার এ বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেয় না। এ বিষয়ে সরকার কোন পদক্ষেপ না নেওয়ায় ১৯৪৮ সালে ঢাকা জেলা মহিলা সমিতি ও ছাত্র ফেডারশনের যৌথ উদ্যোগে রাজবন্দিদের মুক্তির জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

করোনেশন পার্কে ১১ সেপ্টেম্বর (১৯৪৮) নিবেদতা নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বহু মহিলা ও তরুণী যোগ দেয়। তখন বিভাগোত্তরকালে প্রথমবারের মতো রাজবন্দিদের মুক্তিসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে লীগ সরকারের বিরুদ্ধে নারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। পুলিশ সভা ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং এর কর্মীদের গ্রেফতার করে। 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি দিয়ে পুলিশ পুরো সভা ঘিরে ফেলে। মারধর ও অশ্লীল গালাগাল দিয়ে মহিলাদের থানা পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে তাদের বন্দি করে।[১২] এসকল বন্দিদের মধ্যে ছিলেন- নিবেদিতা নাগ, সুদেবী মুখোপাধ্যায়, বেবি, রাধারানী সাহা, উমা রায়, কণা পাল, নিরূপমা গুপ্ত, হাসি মুখার্জি প্রমুখ। তারা হাজতে থেকেও অনশন করেন। ৫৮ দিন বন্দিরা অনশন করেছিলেন। নিবেদিতা নাগ, যিনি নারায়ণগঞ্জের তেলেরাম কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে স্মৃতিচারণ করে বলেন, "আমরা জানতাম না যে ওই দিন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন। শাসকদলের লোকেরা আমাদের শোনাল - কী দুঃসাহস! জিন্নাহর জন্মদিনে প্রতিবাদ ও সভা! চিন্তা করা যায় না। আমাদের সকলের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেয়া হলো। জেলের মধ্যে তার বিচার হলো।"[১৩] পঞ্চাশের দশকধরে পূর্ব বাংলায় আন্দোলনকারী নারীদের ওপর এভাবে জুলুম নির্যাতন চলেছে। কিন্তু তারা থেমে থাকেন নি। বরং দ্বিগুন শক্তিতে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন। মূলত এভাবেই নারীরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নারী শিক্ষার প্রতি সরকারের নেতিবাচক মনোভাব ও এর বিরুদ্ধে নারী সমাজের আন্দোলন

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পূর্বেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টি পর অধিকাংশ হিন্দু ছাত্রী ভারতে চলে যাওয়ায় শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠানগুলোতে নৈরাজ্য দেখা দেয়। মুসলিম ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই সামান্য হওয়ায় সরকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সিলেটে মহিলা কলেজ বন্ধ না করার জন্য জোবেদা খাতুন চৌধুরী তৎকালীন গভর্নর ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি গভর্নরকে সিলেটের মহিলা কলেজ বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করেন। এজন্য তাঁকে ১ বছর সময় দেয়া হয়েছিল। এছাড়াও তাকে বলা হয়েছিল যথেষ্ট ছাত্রী না থাকলে কলেজ বন্ধ করে দেয়া হবে। তখন তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে কলেজটিকে চালু রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু সিলেট মহিলা কলেজ নয় ইডেন কলেজ, কামরুন্নেসা গালর্স স্কুলকেও একত্রিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালে ১৫ নম্বর এলাকা প্রায় ৫০০ ছাত্রী ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এতে ছাত্রীদের সাথে শিক্ষয়িত্রীরাও ছিলেন। কেননা দুটি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনেকের পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক শিক্ষিকার চাকুরী চলে যায় ।

বেগম ও নারী চেতনা

শিল্প-সাহিত্য প্রচার-প্রসারের জন্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পূর্ব-বাংলায় শিল্প-সাহিত্য বিস্তারের জন্য কোন সংগঠন ছিল না। ১৯৫০ সালে মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকায় থেকে *বেগম পত্রিকা* প্রকাশ করা হয়। ১৯৫৪ সালে *বেগম ক্লাব* পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। শামসুন্নাহার মাহমুদ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী। সম্পাদক নাসিরউদ্দিন 'বেগম' পত্রিকার মাধ্যমে নারী জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বেগম ক্লাবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের প্রগতিমনা লেখিকা, সমাজসেবী, শিল্প-গায়িকা ও নারী আন্দোলনের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। দেশের মহিলা সমাজসেবী, সাহিত্যিক, শিল্পীদের পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান করা, মত বিনিময় করা, নারী প্রগতি, মর্যাদা ও অধিকার বিষয়ে সম্মিলিত কর্মসূচি নেয়ার জন্য *বেগম ক্লাব* যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে।[১৪] বাংলাভাষা, শিল্প-সাহিত্য সাধনা করা, নারীদের বিভিন্ন জ্ঞানমূলক চিন্তাধারা, মতামত, সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা, লেখক-সাহিত্যিকদের সাহিত্য আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে বেগম পত্রিকা কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। 'বেগম' পত্রিকাটি নারী-পুরুষ সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছিল। 'বেগম' পত্রিকা নারীর জ্ঞানচক্ষুকে আলোকিত করেছিল।

আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মহিলা, শান্তি নিকেতনের শিল্পী, দেশ-বিদেশের সাংবাদিক, দেশের বিশিষ্ট মহিলা নেত্রী, গায়িকা, লেখিকা, শিল্পীদের বেগম ক্লাবে সংবর্ধনা দেয়া হতো। 'সওগাত' ও 'বেগমে'র

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা পর্ব থেকেই বেগম সুফিয়া কামাল এসবের সাথে যুক্ত ছিলেন। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, হোসনে আরা মোদাব্বের, খোদেজা খাতুন, সারা তৈফুরা, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, লুলু বিলকিস বানু, মাহজাদী বেগম, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, সেলিনা বাহার প্রমুখ মহিলা ও তরুণী বেগম ক্লাবে জমায়েত হতেন। এই ক্লাবের মাধ্যমে নারী জাগরণ, শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মহিলারা একত্রিত হয়ে কাজ করেছেন। এই ক্লাবকে পরবর্তী দশকে নারী আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে তুলনা করা হয়। সরকারের নানা অত্যাচার, নির্যাতন 'বেগম পত্রিকা' ও 'বেগম ক্লাব' খুব দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে পেরেছিল। সেসময় পুরানো পল্টন, আজিমপুর, শান্তিনগরসহ আশে-পাশের এলাকার সচেতন নারীরা বেগম ক্লাবে প্রায়ই একত্রিত হতেন এবং তাদের কাজকে এগিয়ে নিতেন। এভাবেই *বেগম* সবার কাছে জায়গা করে নিতে পেরেছিল।

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও পূর্ব-পাকিস্তানের নারী সমাজ

১৯৫২ সালেই পূর্ব-পাকিস্তান আইনসভার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভাষা সংগ্রামের পরপরই নির্বাচন হলে মুসলিম লীগের পরাজয় নিশ্চিত জেনে নির্বাচন এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হয়। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রচন্ড দাবির মুখে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয় ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৪ সালে ৮ মার্চ থেকে ১২ মার্চ ঐ নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েছিল।[১৫] ভাষা দিবস, রাজবন্দির মুক্তি, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক এজেন্ডায় এ দেশের নারী সমাজ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়াও নারীরা যুক্তফ্রন্টের দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম লীগ সরকার নারীদের উপর কূপমণ্ডুক আইন কানুন চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য যুক্তফ্রন্টের সাথে মিলিত হন। এছাড়া পৌর এলাকায় মহিলাদের ভোটে মহিলা সদস্য নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল। এ ক্ষেত্রে নারীদের আসন সংখ্যা সংরক্ষিত ছিল।

১৯৫৪ সালের ৭ আগস্ট ঢাকা গেজেটে নির্বাচনী আইন সংশোধনী দিয়ে বলা হয় যে, কোন মহিলা যে কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন, তাকে সেই স্থানের ভোটার হতে হবে। নির্বাচনের আগে হঠাৎ এই ঘোষণায় নারীরা এ আইনের প্রতিবাদ জানায়। সকল শ্রেণীর নারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সম্মেলন ডাকা হয়। এ সম্মেলনের উদ্যোগতা ছিলেন হালিমা খাতুন, মিসেস সুফিয়া (লিলি), ইশতিয়াক, মরিয়ম খোন্দকার, আমেনা বেগম, লায়লা সামাদ, লুৎফুন্নেসা প্রমুখ নারীনেত্রী। সংস্কৃতির উপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা বেতারের নারী শিল্পীরা প্রতিবাদ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক প্রজা পার্টি, নেজামে ইসলামীসহ অনেকগুলো দলের সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর *যুক্তফ্রন্ট* নামক একটি নির্বাচনী আঁতাত গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে *যুক্তফ্রন্ট* মুসলিম লীগের বিপক্ষে দাঁড়ায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নারী প্রার্থী হিসেবে আইন পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা খাতুন, বদরুন্নেসা খাতুন। এসময় নেলী সেনগুপ্তা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। যুক্তফ্রন্টের মুসলিম মহিলা আসন ছিল ৯টি। এদের বিজয় সাফল্যে নারী সমাজের মধ্যে আলোড়ন ও আত্মবিশ্বাস জাগে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে নারী সমাজ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠতে থাকে।[১৬] একসময়ের মুসলিম লীগ নেত্রী জোবেদা খাতুন চৌধুরী এই সময় দল ত্যাগ করেন ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন তবে জয়ী হননি। নূরজাহান মোর্শেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মুসলিম লীগ থেকে দাঁড়িয়েছিলেন শামসুন নাহার আহমদ। তিনিও পরাজিত হন। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য নুরজাহান মোর্শেদ, বেগম রাজিয়া বানু ও দৌলতুন্নেসাকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[১৭] যুক্তফ্রন্ট ঘোষিত ২১ ফেব্রুয়ারির সরকারি ছুটি ৯২ (ক) ধারা দিয়ে বাতিল কথা হলে ছাত্র ধর্মঘটে ছাত্রীরা যোগ দেয় এবং নারী সমাজ এতে ব্যাপক সমর্থন যোগায়। ১৯৫৫ সালে একুশে ফেব্রুয়ারির শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলে ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও মিছিলে অংশ নেয়। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীরা এসময় মিছিলে অংশ নেন। এই সময় মহিলাদের বিভিন্ন কাজ করায় পরিবেশ তৈরি হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা সদস্যদের উদ্যোগে ১৯৫২-১৯৫৩ সালে গঠিত শিশুরক্ষা সমিতির কাজ পুনরায় শুরু হয়।[১৮]

১৯৫৫ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় লবন ও তেলের দাম বাড়ানো হলে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে সরকারি সংগঠন আপওয়ার মহিলারা ছাড়া দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের সংঠনের মহিলারা মন্ত্রী আতাউর রহমানকে রাস্তায় ঘেরাও করেন। পূর্ব-পাকিস্তানে এই প্রথম মহিলারা প্রকাশ্য রাজপথ ঘেরাও আন্দোলন করেন।[১৯] খাদ্য সংকটের কারণে শিশু ও নারীদের জীবনহানীর কারণে সর্বদলীয় মহিলা কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এসময় নারীরা অন্যায়ের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। সামাজিক-রাজনৈতিক দাবি আদায়ের পাশাপশি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে নারীরা খাদ্যের ভুখ মিছিলে যোগ দেন। দীর্ঘদিন ধরে অভুক্ত নারীদের দাবি ছিল 'চাল চাই'। এসময় থেকে সরকার বিরোধী, আন্দোলনে নারীরা আস্তে আস্তে একত্রিত হয়ে শক্তিশালী হতে থাকে। ১৯৪৬-৪৭ সালে দিনাজপুর, রংপুর, যশোর, খুলনা, পাবনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বগুড়া, চট্টগ্রামসহ অনেক এলাকাতে

Dhaka University Institutional Repository

তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী নাচোলের কৃষকরানী কমরেড ইলামিত্র।

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়। এতে জনগণের অধিকার কুক্ষিগত করা হয়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাতিল, সভা-সংগঠন বেআইনি ঘোষণা করা হয়। সাধারণ জনগণ যাতে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে না পারে এজন্য সারা দেশে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। এসময় সরকার রাজনৈতিক নেতা ও ছাত্রনেতাদের গ্রেফতার করে। তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়। এছাড়া সরকার ছয় বছরের জন্য সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে দেয়। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়, এ অবস্থায় নারীদের অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলন আপাতত নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৫৯ সাল থেকে সামাজিক ও ধর্মীয় সভানুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হতে থাকলে নারীরা কিছু কিছু সভা-সমাবেশ, মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদির সুযোগে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে একত্রিত হতে থাকেন। ১৯৬০ সালের শুরুতে ধীরে ধীরে নারী সংগঠনগুলো তাদের সাংগঠনিক শাখাগুলো পুনরায় চালু করেন। সেগুলো হচ্ছে- গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতি, ওয়ারী মহিলা সমিতি, শিশুরক্ষা সমিতি, আপওয়া শিশুকল্যাণ সমিতি ইত্যাদি। এসকল মহিলা সংগঠন সামরিক শাসনের মধ্যেও তাদের সম্মেলন, বার্ষিকসভা ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেছে।[২০]

এই সকল সভায় নারী শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি করা, চাকরিজীবী মেয়েদের সমস্যা সমাধানের বিষয়, শিশু আইন প্রবর্তন ও কিশোর অপরাধীদের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপন, পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা। প্রচলিত আইনে নারীর অধিকারগুলো সংশোধন করা, নার্সিং বৃত্তি প্রসার, মেয়েদের চলাফেরার নিরাপত্তা বৃদ্ধি, নারী শিক্ষা সংকোচনের প্রতিবাদ, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে একজন করে মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ, নির্বাচনে মহিলাদের জন্য জাতীয় পরিষদে ৩টি, প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে আসন সংরক্ষণের দাবি নিয়ে আলোচনা, প্রভৃতি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এসব কাজের মধ্যে দিয়ে ঘরোয়াভাবে হলেও মহিলাদের মধ্যে অধিকারের চেতনা ক্রমশ প্রসারিত হয়।[২১]

Dhaka University Institutional Repository

তখন দুই পাকিস্তানের মেয়েরা সীমিত পরিসরে লেখাপড়া করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে ও তারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। ১৯৫৬ সালে আইয়ুব খান পুরাতন শাসনতন্ত্র বাতিল করে নতুন শাসনতন্ত্র চালু করতে চাইলে নারীরা সভা সমিতিতে বক্তব্য দিতে থাকেন। তারাও তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলতে থাকেন। তারা দাবী তোলে যে, 'নারীর সম-অধিকার যেন সংবিধানে রক্ষিত হয়'। নারীদেরকে মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে বন্দি রেখে উন্নতি করা যাবে না। নারী সমাজের জোরালো আন্দোলন-প্রতিবাদের ফলে ১৯৫৬ সালের সংসদে উত্থাপিত ও স্থগিত জাস্টিস রশিদ কমিশনটি আইয়ুব খানের শাসনামলে পুনরালোচিত হতে থাকে এবং কমিশনের সুপারিশগুলো জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা হতে থাকে। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের নারী সমাজের আন্দোলনের ফলে 'পারিবারিক আইন ১৯৬১' প্রণীত হয়। এ আইনটিতে জাস্টিস রশিদ কমিশনের সকল সুপারিশ গৃহীত না হলেও নারী সমাজের অধিকার অর্জনের ইতিহাসে এটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতে বহু বিবাহ প্রথাকে নিরুৎসাহিত করা, স্ত্রীকে যথেচ্ছ তালাক দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করা, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ ও ছেলেদের ২১ নির্ধারণ করা, মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোহরানার দাবি মাত্র পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রভৃতি আইনের ধারা সংযুক্ত হয়। নারী সমাজের বিবেচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ আইনটি নারী আন্দোলনের বিজয় হিসেবে সমতুল্য। এই আইনের ত্রুটি থাকলেও তা জোরালোভাবে নারীদের স্বার্থের পক্ষে ছিল না। তবুও লক্ষ করা যায় যে, উলেমা সম্প্রদায়সহ প্রতিক্রিয়াশীল নারীস্বার্থ বিরোধী গোষ্ঠী ও ধর্মীয় নেতারা এ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন।[২২]

পূর্ব-পাকিস্তানের মাওলানা আব্বাস আলী নারীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে খারাপ প্রচারণা চালন। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলী ও ধর্মীয় নেতারা বলেন, ১৯৬১ পারিবারিক আইন কোরানের পরিপন্থী। ১৯৬১ এর পারিবারিক আইনের কয়েকটি ধারা যেমন- চার বিয়ে নিয়ন্ত্রণ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, বিয়ের বয়স নিদির্ষ্টকরণ, দাদার বর্তমানে বাবার মৃত্যু হলেও নাতি-নাতনির সম্পত্তির অধিকার আদায় ইত্যাদির বিরুদ্ধে ধর্মীয় নেতারা প্রতিবাদ জানান। মাওলানা মওদুদী বহুবিবাহ বন্ধের তীব্র বিরোধীতা করেন। তিনি এও বলেন যে, "তাতে ধর্মীয় আইনের বিরোধীতা হবে।" এ ধরনের প্রতিবাদের বিরুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বস্তরের নারীসমাজ সোচ্চার হয়ে ওঠেন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাক্তন সংসদ সদস্য বেগম শাহনেওয়াজের মেয়ে বেগম নাসিম জাহানের নেতৃত্বে লাহোরের নারীসমাজ বিরাট মিছিল করেন ও পাশ্চাত্য সংসদ ভবনের সামনে মাওলানা আব্বাস আলী খানের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় শামসুন্নাহার মাহমুদ ও বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আপওয়া, শিশুরক্ষা সমিতি, নারিন্দা মহিলা সমিতি, ওয়ারী সংগঠনের মহিলারা প্রতিক্রিয়াশীল নারী স্বার্থবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৬৩ সালের ৫ অক্টোবর বেগম ক্লাবের সম্মেলন করেন।[২৪] ইডেন কলেজের নেত্রী মতিয়া চৌধুরী মহিলাদের দাবী সমর্থন করে বিবৃতি দেন।[২৫] মুসলিম পারিবারিক আইন-১৯৬১ বাতিলের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে প্রস্তাব উঠলে সদস্য রোকাইয়া আনোয়ার পাল্টা প্রস্তাব করেন যে, ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সিলেক্ট কমিটিতে তা পাঠানো হোক। এর ফলে উভয় প্রদেশের মহিলারা প্রতিবাদ করতে থাকেন। পশ্চিম পাকিস্তানের মহিলারা পারিবারিক আইনের পক্ষে ৫০ হাজার মহিলার স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। গোঁড়াপন্থিদের বিভিন্ন সংগঠন, উলেমা ও ধর্মীয় সম্প্রদায় পারিবারিক আইন ও সংশোধনের দাবীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিন্তু নারী সমাজের আন্দোলনের ফলে ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে জাতীয় পরিষদে কোন সংশোধন ছাড়াই আইনটি গৃহীত হয়। এতে দুই পাকিস্তানের নারী সমাজের মধ্যে বিজয় সূচিত হয়।

সামরিক সরকার নারীদেরকে পরিবারিক অধিকার প্রদান করলেও পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এই আইনের প্রয়োগ ছিল দুঃসাধ্য। তবে আইনটি পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে বিরূপ শক্তি প্রতিরোধের একটি খুঁটি হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। আইয়ুব সরকার পারিবারিক আইনটি সমর্থন করলেও নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কোন সদিচ্ছা তার ছিল না। নারীর প্রতি সামরিক সরকার ও প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনা একই রকম ছিল। শাসন নীতি প্রণয়নে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী কমিটিতে নারী সমাজের কোন অংশগ্রহণ ছিল না। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাপ্তবয়স্ক নারী সদস্যদের নির্বাচনে ভোটের অধিকার, ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাতিল হয়ে যায়। ১৯৬২ সালের সংবিধানে ২০ ধারায় জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রত্যেক প্রদেশে ৬টি আসন মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কতৃক সংরক্ষিত ৬টি মহিলা আসনে প্রার্থী মনোনয়ন হওয়ার পদ্ধতি চালু হলো।[২৬] এমহিলা সদস্যরা মূলত রাষ্ট্রপতির পছন্দের ও ইচ্ছার পুতুল হয়ে থাকতেন। কয়েকজন মহিলা মন্ত্রীকেও এসময় নিয়োগ করা হয়।[২৭]

এসময় নারীরা কোন আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারেন নি। কারণ সামরিক সরকার সংবিধানের আলোকে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। তাদের সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের নারীরা সমবেতভাবে প্রকাশ্য রাজনীতি কাজ করতে না পারলেও নেতৃস্থানীয় নারীরা বিভিন্ন সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। 'সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি মূলোচ্ছেদ কমিশনে' যুক্ত সদস্যদের মধ্যে কবি সুফিয়া কামাল ছিলেন উল্লেখযোগ্য। এসময় পতিতা সমস্যা নিয়ে খাইবার পাস থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত এ কমিটির উদ্যোগে বহু জরিপ কাজ চলে। শেষ পর্যন্ত এ কমিটি এ মতে পৌঁছায় যে, সমাজ থেকে দুর্নীতি-অনাচার উচ্ছেদ করে মেয়েদের পতিতা হওয়া বন্ধ করতে হবে। পতিতাদের পুনর্বাসন প্রয়োজন। এত বড় সমস্যা সমাধান করতে যে সরকার ও সমাজ ব্যবস্থা প্রয়োজন তা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সমন্বয় করতে পারবে না। সুফিয়া কামাল ও অন্যান্য সমাজসেবীরা বুঝেছিলেন যে, মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর ছাড়া নারীদের অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব না।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে শামসুন্নাহার মাহমুদ নির্বাচক মণ্ডলীর বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আইন পরিষদ সহনির্বাচক মণ্ডলীতে ২৫ শতাংশ আইন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার দাবি জানান পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য বেগম রোকাইয়া আনোয়ার। মহিলাদের নিরাপত্তার ওপর তিনি গুরুত্ব দেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্য সিরাজুন্নেসা চৌধুরী রোকাইয়া আনোয়ারের প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য বেগম জি এ খান ও মহিমুন্নেসা আহাদ এর বিরোধিতা করেন। ফলে প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। এভাবে নারীর অধিকারের প্রশ্নে আইন পরিষদের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হতে থাকে।[২৮]

জাতীয় পরিষদে প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৩টি করে মোট ৬টি ও প্রাদেশিক পরিষদে ৫টি করে মোট ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। মহিলাদের সংরক্ষিত আসনে জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচনের বিষয়ে জাতীয় পরিষদের সরকারি ও বিরোধী দলীয় সদস্যদের সমঝোতামূলক মতামতের ভিত্তিতে এই মর্মে সংশোধনী উত্থাপিত হয় যে, মহিলা সদস্যরা তাদের সংশ্লিষ্ট প্রদেশ থেকে আইন পরিষদের মাধ্যমে সদস্য নির্বাচিত হবেন।[২৯] এসময় নির্বাচন বিধিতে নির্বাচনী প্রার্থীর অযোগ্যতার বিষয়টি অত্যন্ত অযৌক্তিক ছিল। সরকারি কর্মচারীর স্ত্রী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এই বিধিবলে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে নির্বাচিত সদস্য শামসুন নাহার মাহমুদ অযোগ্য ঘোষিত হলে সেই আসন শূন্য হয় এবং উপনির্বাচন হয়।

এসময় আইয়ুব খান পূর্ব-পাকিস্তানের আসেন। তিনি ময়মনসিংহে গেলে চারজন নারীনেত্রী তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। নেত্রীরা নারীদের পক্ষে নিম্নুক্ত দাবি তুলে ধরেন-

১. স্বামী-স্ত্রী সরকারি কর্মচারী হলে দুইজনকে একই জায়গায় কাজের সুবিধদান করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২. মহিলাদের জন্য সি. এস. এস পরীক্ষার সুযোগ দেয়া এবং পরবর্তীতে সি. এস. এস অফিসার হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

সেসময় মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে যোগদানের সুযোগ ছিল না। পাকিস্তান বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সেলিমা রাইসউদ্দিন ১৯৪৯ সালে সি. এস. এস পরীক্ষা দেন। কিন্তু তখন ঐ পদে নারীদের নিয়োগের বিধান না থাকায় তাঁকে অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাকউন্টেট জেনারেলের পদ দেয়া হয়। ফলে পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে পশ্চিম-পাকিস্তানে চাকুরীজীবী মহিলাদের সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে তোলেন 'বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব'। এরই ধারাবাহিকতায় 'পূর্ব-পাকিস্তান বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব' গড়ে ওঠে।

১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকা ও লাহোরের নারীরা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করেন। এসময় তারা বহুবিবাহ রহিতকরণ ও পারিবারিক আইন কমিশনে উভয় প্রদেশের মহিলা প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করার দাবি জানান। তখন সরকার ঢাকা ও রাজশাহীতে নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য দুটি কেন্দ্র পরিচালনা করতো, কিন্তু সেখানে প্রশাসনিক কাজ ছাড়া আর কিছুই হতো না। কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তানের নারী সমাজ ১৯৬০ সালের ২১ আগস্ট 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মৃতি কমিটি' গঠন করেন। এখান থেকে প্রস্তাব করা হয় যে-

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের নামকরণ 'রোকেয়া হল' করা হোক।
২. বাংলাবাজার গার্লস স্কুলের নামকরণ 'রোকেয়া মেমোরিয়াল স্কুল' করা হোক।

এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের নাম 'রোকেয়া হল' করা হয়। ১৯৬৬ সালে আয়েশা জাফরের উদ্যোগে গঠিত হয় 'নারীকল্যাণ সমিতি'। এসময় গণতান্ত্রিক আন্দোলন রহিত করার জন্য সরকারের উদ্যোগে দাঙ্গা বাঁধানো হয়। ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। আইয়ুব খানের শাসনে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রতিক্রিয়াশীলদের উস্কানিতে সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সুফিয়া কামাল, সানজিদা খাতুন, রোকেয়া রহমান কবীরসহ আরো বহু মহিলা পাড়ায় পাড়ায় সংগঠিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। এসময় ছাত্রী হলগুলোতে হামলা করলে এসব নারীরাই প্রতিরোধ করতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

এসময় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতা-কর্মীদের সহযোগিতায় প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তোলেন। 'পূর্ববঙ্গ রুখিয়া দাঁড়াও' এই স্লোগান সম্বলিত প্রচারপত্র সরবরাহ করে জনগণকে সচেতন করা হয়। মহিলারা দাঙ্গা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক নেতারা সেটা ভালোভাবে নেননি। পুরুষরা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি।

বিরোধী রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায়ের সংগ্রাম শুরু হলে নারী সমাজের মধ্যে প্রচুর সাড়া জাগে। খাজা নাজিমুদ্দিনের উদ্যোগে পাঁচটি বিরোধী দল নির্বাচনের লক্ষ্যে ৯ দফা কর্মসূচি নিয়ে 'কপ' গঠন করে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' Cop মিস ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনীত করে। মিস ফাতেমা জিন্নাহ গার্লস গাইডের প্রধান ও নার্সিং সমিতির উপদেষ্টা ছিলেন। এসময় সামরিক সরকারের পক্ষ থেকে জোর প্রচারণা চালানো হয় যে- রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ নয়।

কিন্তু ধর্মীয়নেতা মাওলানা মওদুদীসহ অনেকে ফতোয়া দিলেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা নির্বাচন জায়েজ।[৩০] যা ছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির ওপায়। তবে একথা সত্য যে, আইয়ুব বিরোধী মোর্চায় প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি প্রভৃতি সংগঠনগুলো নারীদের বিপক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা করেনি।

মিস ফাতেমা জিন্নাহকে রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর পর তাঁর নির্বাচনী কর্মসূচিতে নারীর অধিকার সংকোচনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ধর্মীয় উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রচারণা ছিল এরূপ যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি পুরুষ প্রার্থী, তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করিয়া শরিয়তকে বিকৃত করিয়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক, ইসলামের আধুনিকীকরণের চেষ্টা ইত্যাদি ব্যাপারে পবিত্র কোরাআনের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন। তাহাকে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না। অপরপক্ষে যিনি মহিলা প্রার্থী তিনি কোরান ও সুন্নাহ মোতাবেক মুসলিম পারিবারিক আইনে অনৈসলামিক ধারা সংশোধন করার ওয়াজ করিতেছেন এবং পবিত্র শরিয়তকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করিতছেন।[৩১]

এ ধরণের প্রচরণায় পূর্ব-পাকিস্তানের আপওয়া, পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সংসদ, লেডিস ক্লাবসহ বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদ করতে থাকে। বেগম সুফিয়া কামাল, দৌলতুন্নেসা, তুবা খানম, রোকেয়া রহমান

Dhaka University Institutional Repository

কবির, কামরুন্নাহার লাইলী, রইসা হারুনসহ অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন যে, দেশের এক শ্রেণীর মানুষ ধর্ম ও শরীয়তের নামে মহিলা সমাজকে মধ্যযুগীয় জীবনধারায় ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। নারী সমাজের কাছে এসব গ্রহণযোগ্য হবে না। তখন নারীরা সভা-সমিতিতে মিছিল করতে থাকে। ফাতেমা জিন্নাহ যে দিন পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচনী প্রচারণায় আসেন সেদিন মহিলারা এক প্রতিবাদ মিছিল করেন। তিনি মহিলা নেত্রীবৃন্দকে বিরোধী দলের নেতাদের সাথে কথা বলার জন্য অনুরোধ করেন। যার ফলে, সুফিয়া কামাল মহিলা সংগঠনের ১৫ জন সদস্যের এক প্রতিনিধি দলসহ বিরোধী দলের সাথে আলাদাভাবে দেখা করেন। নারী সমাজের দীর্ঘ সংগ্রামের পর অর্জিত অধিকার বাতিল করার দাবি জানিয়ে বিরোধী দল অন্যায় করছে বলে নারীরা নিন্দা করেন। আইনের ৮ নং দফাটি ছিল নারীদের বিপক্ষে। নারীরা ৮ নং দফাটি প্রত্যাহার না করলে নারীস্বার্থ বিরোধী দলকে নির্বাচনে সমর্থন দিতে রাজি হয়না। এদিকে নারীদের সংগ্রাম প্রতিরোধের মুখে আওয়ামীলীগ ৮ নং ধারা সম্পর্কে স্পষ্ট করে না বলে, দ্বিমত জনিত বক্তব্য দেয়। তবে কমিউনিস্ট পার্টিও ৮ নং ধারার বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে প্রচার অব্যহত রাখে।

সর্বোপরি ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ প্রেসিডেন্ট পদে অংশগ্রহণ করলে দেশের মধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকজুড়ে সমাজ কল্যাণমূলক কাজের বাইরে এ দেশের নারী সমাজ পারিবারিক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সংগ্রামে এবং ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়েছে। এসব ছাড়াও তারা সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু সব সময় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক মহলও নারীসমাজের অধিকারের স্বার্থ বজায় রাখার পক্ষে ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, গণতান্ত্রিক শক্তি-উভয়ের শ্রেণির কাছে থেকেই নারীর অধিকার রক্ষার জন্য এ দেশের নারীসমাজকে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করতে হয়েছে।[৩২] পূর্ব বাংলার পশ্চাৎপদ নারী সমাজ অশিক্ষা, অর্থকষ্ট, পারিবারিক চাপে অবরুদ্ধ ছিল। তারা নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। যার কারণে শামসুন নাহার মাহমুদ, সুফিয়া কামাল, দৌলতুন নেসা প্রমুখ নারী নেত্রীরা নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নানান মত ও পথের অনুসরণ করেছেন। নারী জাতিকে বিকশিত করতে বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। নারীরা প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করতে যেয়ে সবার রোসানলে পড়েছে। তবে নারী সমাজের সুদৃঢ় সমর্থন থাকায় তাদেরকে সরকারি দলের দমন-পীড়নের শিকার হতে হয়নি। তবে সরকারি কর্মচারীর স্ত্রীরা এসকল আন্দোলন মূলক কাজ করলে পরিস্থিতি হতো ভয়ঙ্কর। সুফিয়া কামালের স্বামী সরকারি চাকুরী করতেন। সরকার সুফিয়া কামালের কার্যক্রমের জন্য তাঁর স্বামীর প্রমোশন বহুদিন আটকে রেখেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

এসব নারী নেত্রীরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় প্রতিবাদ করেন। খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যান্য জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ায় সুফিয়া কামালসহ ২২ জন নারী প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন। মহল্লায় মহল্লায় সমবায় দোকান প্রতিষ্ঠা করা, মহিলা ক্রেতা সমিতি, অত্যাবশ্যকীয় জিনিস বিক্রির জন্য তারা নারীদেরকে উৎসাহ দেন। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে নারী শ্রমিকরা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। ইট ভাঙ্গার কাজ, পেটে ভাতে কাজ, চা শ্রমিকের কাজ, নার্সের কাজ করে থাকে। ১৯৬৪ সালে জুলাই মাসে তৎকালীন মেট্রন আক্তার বানু সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে মহান নার্সিং পেশায় তরুণীদের যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। তখন পর্যন্ত মাত্র ১৯ জন সিনিয়র সিস্টার, ৪০ জন স্টাফ নার্স, ৪৪ জন ব্রাদার্স ছিল। তবে শিক্ষকতায় মেয়েদের অধিক সংখ্যায় যোগদানের আকাঙ্ক্ষা অব্যাহত ছিল।[৩৩]

এসময় নারীরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে পরিবারিক দায়িত্ব পালনের জন্য সুবিধামতো পার্টটাইম চাকুরীর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাতে থাকেন। তারা শিশু অপহরণকারীকে ২০ বছরের কারাদণ্ড দাবি জানান। নার্সদের বেতন দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় সকল মহিলা সংগঠন সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে সরকারের নিন্দা করেন। এরপর নার্সদের সমস্যা বিবেচনা করার জন্য প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী আশ্বাস দেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় সরকারি উদ্যোগে নারীদের প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সাধারণ মহিলারা আপওয়ার উদ্যোগে রাইফেল চালানো, সামরিক শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, নার্সিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। তখন তারা সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে বিভ্রান্ত হননি।

১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ ৬ দফা কর্মসূচি দিয়ে পূর্ববঙ্গে পরিপূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে। নারীসমাজ তখন বুঝতে পারে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সরকারের শাসননীতির চরম বৈষম্যপূর্ণ। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙ্গালী জনগণের জীবনের সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন দারিদ্র ও অসহায় নিরাপত্তাহীন অবস্থা। দেশ বিপন্ন বলে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের উপর সামরিক কর চাপিয়ে দিল ঠিকই কিন্তু সীমান্তজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেনি।[৩৪] ১৯৬৭ সালের ৮ মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের নারী সংগঠনের আমন্ত্রণে কবি সুফিয়া কামাল সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমনে যান। বিশ্বের প্রথম মহিলা নভোচারী ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভা তাদের সম্মানিত করেন। এদেশে তিনি প্রথম এই নারী যিনি সমাজতান্ত্রিক কোন দেশের আমন্ত্রিত হন। তাঁর এ ভ্রমনের ব্যাপক ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নারী শিক্ষা বিষয়ে আইয়ুব সরকারের শিক্ষা নীতিতে বলা হয় যে, মা ও গৃহিনী হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই অযৌক্তিক শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ছাত্রীরা আন্দোলন করে। নারীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেশবিভাগের পর থেকে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচন ও সমাজ-সংস্কারমূলক কাজের মাধ্যমে নারীদের কাজের বিকশিত রুপ দৃশ্যমান হয়। ছাত্ররা যখন সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হচ্ছিল। তখন পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের নির্যাতন নেমে আসে ছাত্র-জনতার ওপর। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সামরিক সরকার ছাত্রীদের উপর বেধড়ক লাঠি চার্জ করে। ২০ জানুয়ারি শহীদ হন ছাত্র আসাদুজ্জামান। আসাদের মা ছাত্রদের কাছে একটি বাণী পাঠান যে, 'আমার আসাদের মৃত্যু হয়নি। আমার আসাদে বলত, মা আগামী দশ বছরের মধ্যে এই মাতৃভূমি নতুন জীবন পাবে। আমার আসাদের এই স্বপ্ন তোমরা সার্থক করো।'

১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি ৫০০০ ছাত্র-ছাত্রী বেষ্টিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার থেকে শোকের মিছিল বের করে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে এর মধ্যে কমপক্ষে ৫০০ জন ছাত্রী ছিল। ২৪ জানুয়ারী ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে হরতাল পালন করা হয়। পুলিশের বাঁধা ভেঙেগ ঢাকা শহরে ছাত্রদের মিছিল থেকে কালো পতাকা হাতে দীপা ও তরু আহমেদ এগিয়ে যান।[৩৫] ২৪ জানুয়ারি সুফিয়া কামাল নারী নেত্রীদের ডেকে নিজ বাসায় সভা করেন, এবং একটি শোকসভার ডাক দেন। ৭ ফেব্রুয়ারি, নারী সমাজের প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ২৫ জানুয়ারি ঢাকায় পুলিশের গুলিতে নাখালপাড়ার আনোয়ারা খাতুন ও তার শিশু নিহত হয়। ২৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রী ছাত্র-জনতার উপর হামলার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। তাঁরা বলেন, 'এ অন্যায় নীতির ভয়াবহ পরিনামের জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।' ২৮ জানুয়ারি চট্টগ্রামে কালো দিবস পালন করে ছাত্রীরা। তারা বিরাট মিছিল করে এম. সেন হলে খালেদা খানমের সভাপতিত্বে সভা করেন। এতে বক্তব্য রাখেন তাসমিন আরা, রাশেদা খানম, হান্নানা বেগম, মমতা বেগম, নাজমা আরা বেগম, রওশন আরা বেগম, শিরিন কামাল প্রমুখ নারী নেত্রীবৃন্দ। ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০ টায় সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে শহীদ মিনারের পাদদেশে নারীরা জমায়েত হতে থাকে। আড়াই হাজার নারী মিছিল করে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে নবাবপুর হয়ে বাহাদুর শাহ্ পার্কে যান। বোরকা পরা হাজার হাজার পর্দানশীল নারী এ মিছিলে যোগ দেন। নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়ির পুরুষরা ও নারীরা তাদের উপর ফুল ও গোলাপ পানি ছিটিয়ে দেন। ছাত্রদের ১১ দফা দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে নারী সমাজ ।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তির জন্য নারীদের দাবিনামা তৈরীর প্রতি উৎসাহ দেখা যায়। এজন্য দেশের নারীসমাজ মূল রাজনৈতিক প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে 'মহিলা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। এই সংগঠনের আহবাহিকা ছিলেন মালেকা বেগম। সদস্যদের মধ্যে সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ সদস্যও ছিলেন। এছাড়া জোবেদা খাতুন চৌধুরী, বদরুন্নেসা আহমেদ, জোহরা তাজউদ্দিন আমেনা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, সেলিনা বানু, রাজিয়া বানু, সারা আলী প্রমুখ ছিলেন। নারীদের ইস্যুগুলোর মধ্যে ছিল- বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, যৌতুক বিরোধী আইন এবং সামাজিক নীতি নির্ধারণ করা, নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি।

১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নারীরা শহীদ দিবস পালন করেন, প্রভাতফেরীতে যোগ দেন। সে বছর শহীদ দিবসে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২৩ মার্চ ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর একটি মিছিলে সর্বস্তরের নারী ও পুরুষ যোগ দেন। এ বিশাল মিছিলে ছিলেন সুফিয়া কামাল, হাজেরা মাহমুদ, জোহরা তাজউদ্দিন, ফরিদা হাসান, মালেকা বেগম, দীপা দত্ত, আজিজা ইদ্রিস প্রমুখ। উনসত্তরের আন্দোলনে যখন সবকিছু উত্তাল, সব দলমতই তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ে একত্রিত হচ্ছিল। সেসময় নারীদের সব ধরনের দাবি-দাওয়া আদায়ের কথা মহিলা সংগ্রাম পরিষদের ঘোষণা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়েছিল। সেসময় ছাত্রীরা নারীদের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে। এই গণজোয়ারে স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্রীরা সক্রিভাবে যুক্ত ছিলেন। আয়েশা খানম, মুনিরা আক্তার, মাহফুজা খানম, মিনি মর্জিনা, ফওজিয়া মোসলেম, রোকেয়া কবীর, শামসুন নাহার, ফোরকান বেগম প্রমুখ ছাত্র ইউনিয়ান ও ছাত্রলীগের নেত্রীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৭০ সালে সুফিয়া কামালের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ'। আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের মহিলা সদস্যরা দলীয় রাজনৈতিক কার্যাবলির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে কাজ করছিল। পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদের তরফ থেকে ঐ সময় সংরক্ষিত আসনে গণভোটে সরাসরি নির্বাচন, রাজবন্দিদের মুক্তি, নারী শ্রমিকদের মজুরিগত বৈষম্য দূর করা, পর্যাপ্ত সংখ্যায় মাতৃসদন প্রতিষ্ঠা, শিশু হাসপাতাল স্থাপন, খাদ্যে ভেজাল বন্ধ করা, জিনিসের দাম কমানো ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবির পাশাপাশি নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি তোলা হয়েছিল। [৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাতজন নারী সদস্য সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন। তাঁরা হচ্ছেন-বদরুন্নেছা আহমেদ, নুরজাহান মুরশিদ, তাসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আক্তার ডলি, ও মমতাজ বেগম। জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাতজন সদস্য অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন দেশের নারীসমাজ ও ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, ১৯৪৭ থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত নারীরা বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অসামান্য অবদান রাখেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ ধরে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটো আলাদা অংশে বিভক্ত ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে নারীসমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে 'আপওয়া' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে সুফিয়া কামাল, লীলা রায় (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী), মিসেস মোতাহার হোসেন, মিসেস মানিক ঘোষ, রহিমুন্নেসার সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গড়ে ওঠে। এসমিতি কৃষকদের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরে, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় আন্দোলন করে এবং রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু পরিবারগুলো ভারতে চলে যাওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যায়। এ অবস্থায় সিলেটের নারী অধ্যক্ষ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাত করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে পূর্ব বাংলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও ছাত্রী নেত্রীবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫৪ সালে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যুক্তফ্রন্টের নারী প্রার্থী হিসেবে নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুন্নেসা, বেগম রাজিয়া বানুকে প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টরি সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়। এ সময় নারী শিক্ষা প্রসার, মেয়েদের চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি, শিশু আইন প্রবর্তন, নার্সিং বৃত্তি প্রসার, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে একজন মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ জন্য নারীরা দাবি তোলেন। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীদের কল্যাণার্থে বহুবিবাহ রোধ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, মোহরানা পরিশোধ, বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা হয়। ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদে ৬ টি ও প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৬ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। এছাড়া এসময় স্বামী-স্ত্রী সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী হলে উভয়কে একই স্থানে কাজের সুযোগ দেয়া ও নারীদের সি.এস.এস পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য দাবি তোলা হয়। উল্লেখ্য

Dhaka University Institutional Repository

যে, এসময় নারী নেত্রীবৃন্দের চেষ্টায় 'পূর্ব-পাকিস্তান বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নারীদের দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নিবাসের নামকরণ করা হয় 'রোকেয়া হল'। ১৯৬৪ সালে সম্মিলিত বিরোধী দল 'কপ' গঠন করে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে নারীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ সুগম করেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের প্রথম নারী হিসেবে সুফিয়া কামাল সোভিয়েত ইউনিয়নের নারী সংগঠনের আমন্ত্রণে রাশিয়া যান। ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে বিভিন্ন বিপুল সংখ্যক ছাত্রী অংশগ্রহণ করেন। ২৪ জানুয়ারি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে নারীরা একটি বিশেষ সভা করেন এবং শহীদ মিনারের পাদদেশে একত্রিত হয়ে একটি মিছিল নিয়ে সমগ্র সারা ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন শিক্ষকের স্ত্রী ছাত্র-জনতার উপর হামলার কারণে একটি বিবৃতি দেন। এছাড়া উনসত্তরের গণজোয়ারে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেলের কলেজের ছাত্রীরা যোগ দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ৭ জন নারী সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসবই ছিল বাংলার নারীর রাজনৈতিক অর্জন। এজন্য তাদেরকে অনেক প্রতিকূলতা ও কন্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। পাকিস্তানের সমাজ ও রাষ্টের নানা নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, সমাজপতিদের নানাধরণের বিষবাক্যে জর্জরিত হতে হয়েছে। এত কিছুর পরেও পূর্ব বাংলার নারীরা তাদের অগ্রযাত্রার পথে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। মূলত এসব আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই বাংলায় নারীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে ধারা বিকশিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. খোকা রায়, *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৯

২. রেণু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিস্ট মেয়েরা (১৯৪০-১৯৫০)*, মনীষা গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ৮৯

৩. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৮৯

৪. বাংলাদেশের প্রথম মুসলমান মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ৮ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ঢাকা

৫. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (ed.), *Women of Pakistan*, zed Books Ltd. London, 1987, p.52

৬. আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, *শামসুন্নাহর মাহমুদ (১৯০৮- ১৯৬৪)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৬

৭. বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন চৌধুরী, *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, প্রাগুপ্ত

৮. মালেকা বেগম, *সুফিয়া কামালের কথা*, মালেকা বেগম কতৃক গৃহীত কবি সুফিয়া কামালের সাক্ষাৎকার, জুন ১৯৮৭।

৯. মালেকা বেগম, *বাংলায় নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ . ১২৪

১০. হেনা দাস, *স্মৃতিময় দিনগুলো*, চারিদিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪৫

১১. সত্যেন্দ্র সেন, *মনোরমা বসু*, খান ব্রাদার্স অ্যাণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৪৭

১২. জতান চক্রবর্তী, *ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ১২৬

১৩. নিবেদিতা নাগ, *পূর্ববাংলার মহিলা সমিতি ও নারী আন্দোলন*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলিকাতা, ১৯৮৭

১৫. খোকা রায়, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১২২

১৬. *নূরজাহান মোর্শেদের সাক্ষাতকার*, ১৯৮৬

১৭. *প্রাগুপ্ত*, ১৯৮৬

১৮. খোকা রায়, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৬০

১৯. মালেকা বেগম, ১৯৮৭, *প্রাগুপ্ত*

২০. মালেকা বেগম, ১৯৮৯, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৪৭

২১. *সাপ্তাহিক বেগম*, ঢাকা, পৃ. ৫৭-৬২

২২. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed (ed.), *op.cit*, p.86-87

২৩. *Ibid*, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

২৪. *সাপ্তাহিক বেগম*, ১৯৬৩, ১২ অক্টোবর

২৫. *প্রাগুপ্ত*

২৬. Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, *op.cit*, p.95

২৭. *সাপ্তাহিক বেগম*, প্রাগুপ্ত

২৮. মালেকা বেগম, ১৯৮৯, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫০

২৯. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫০

৩০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, ২য় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২৪০

৩১. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৪৪

৩২. মালেকা বেগম, ১৯৮৯, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫৪

৩৩. *সাপ্তাহিক বেগম*, ঢাকা, ১৯৬৪

৩৪. মালেকা বেগম, ১৯৮৯, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫৬

৩৫. মালেকা বেগম, *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পর্ব, *মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ২০৫

৩৬. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২০৫

৩৭. প্রাগুপ্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও নারী সম্প্রদায়

ভারত বিভক্তির আগ থেকেই অফিস-আদালত, পাঠ্যপুস্তকের ভাষা বার-বার পরিবর্তিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ভাষা বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি নতুন করে সৃষ্টি হলেও ভাষা নিয়ে সঠিক কোন সিদ্ধান্ত ছিল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বহু আগে থেকেই উর্দু বনাম বাংলা নিয়ে মুসলিম নেত্রীবৃন্দের মধ্যে বিতর্ক দেখা দেয়। ১৯৩৭ সালে জিন্নাহ উর্দুকে দলের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের বিরোধিতার কারণে সে উদ্যোগ সফল হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে জনগণের ওপর নানারকম শাসন-শোষণ চালাতে থাকে। তাদের এই নির্যাতনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। পাকিস্তানি সরকার এদেশের ৫৬% জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও জোরপূর্বক উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এদেশের মানুষ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেননি। তারা পাকিস্তানি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, হরতালসহ নানারকম প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু সরকার অনড় অবস্থায় থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এসময় সরকারি নির্দেশনার বাইরে যেয়ে বাংলার ছাত্রসমাজ, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই আন্দোলন প্রথমে ঢাকা কেন্দ্রিক হলেও পরবর্তীতে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ আন্দোলনে বাঙ্গালী জাতি সফলতা লাভ করে এবং এই আন্দোলনের সফলতা পরবর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। একথা বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন বাঙ্গালী জাতির জীবনে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। উল্লেখ্য যে, এই আন্দোলনে ছাত্রদের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আলোচ্য অধ্যায়ে ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা সম্বলিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তানি নেত্রীবৃন্দের শোষণমূলক মানসিকতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন তারা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০% লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.৩৩% লোকের উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা (Lingua Franca) করার প্রস্তাব করেন।[১] ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পরবর্তী সময়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে হিন্দি ভাষার পাল্টা দাবি হিসেবে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতা আরোও জোরালো হয়।[২] কিন্তু ১৯৪৬ সালের '৩রা জুন পরিকল্পনা' মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হলে স্ব-শাসিত পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্ন নস্যাৎ হয়ে যায়।[৩] একক পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত হলে প্রশ্ন তৈরি হয় ভাষা নিয়ে। তাই পাকিস্তানের ভাষা উর্দু হবে কিনা এ নিয়ে মুসলিম নেত্রীবৃন্দের কোন সংশয় ছিল না। মুসলিম লীগের নেত্রীবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। নেতাদের এই নিশ্চিত মনোভাবকে কেন্দ্র করে বাঙালি শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে তারা ব্যাপক লেখালেখি শুরু করেন।[৪] বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল থেকে বাংলাকে ' ভারতের সাধারণ ভাষা ' করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। প্রথম বাঙ্গালী নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠিত ১৯২০ সালের এক সভায় মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। এসময় ড. এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *কৃষ্টি* পত্রিকায়-পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে *উর্দু ও বাংলা* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাতে উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশী ভাষা বলে বর্ণনা করেন এবং এ ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিরোধিতা করেন।[৫]

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে আজাদ পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়- মাতৃভাষা আর রাষ্ট্রভাষা এক নয়। আমাদের খোদা, কোরান, পতাকা এক তাহলে ভাষা এক হবে না কেন ? অনেক লেখকরা বলেন- উর্দুকে পশ্চিম-পাকিস্তানের আর বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা এবং উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে স্কুল-কলেজের আবশিক্য পাঠ্য হিসেবে গণ্য করা হোক। এছাড়া আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার প্রেক্ষিতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। তবে এ প্রতিকূল পরিবেশেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এসময় লেখক-সাহিত্যিকগণ সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও উর্দু ভাষার সমর্থক সরকারী দল মুসলিম লীগের অপ্রতিহত প্রচেষ্টা অব্যহত ছিল। শুধু তাই না, পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সম্প্রদায়, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও অছাত্র সামগ্রিকভাবে না হলেও অধিকাংশই একমাত্র উর্দুভাষায় সমর্থক ছিলেন, অথবা উর্দু ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রভাষার কথা চিন্তা করেননি।[৬] আব্দুল হক [১৯১৮-২০০৬, লেখক ও বাংলা একাডেমির পাঠ্যপুস্তক বিভাগের প্রাক্তন পরিচালক] তিনি সেসময় 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন যে, "বাঙালির জাতীয়বোধ এখনো পরিপূর্ণভাবে স্ফূরিত হয়নি। তার জাতীয় মর্যাদাবোধ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। এই কারণেই বাঙালিরা সাধারণত বুঝতে পারে না যে, নিজ বাসভূমি ও ইংরেজ তথা অবাঙ্গালিদের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরই ভাষায় কথা বললে জাতীয়তাবোধের দিক থেকে নিজেকে ছোট করা হয়, নিজের অমর্যাদা করা হয়, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়। ...আমরা কেন আমাদের দেশে ইংরেজি উর্দু হিন্দি বলতে বাধ্য থাকব? আমাদের দেশে যারা বাস করে সেই সব ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি ভাষাভাষীরা কেন বাংলা শিখতে বাধ্য থাকবে না?[৭]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গোঁড়াপত্তনের আগ থেকেই ভাষা নিয়ে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল না। তবে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অপ্রতিরোধ্য প্রচেষ্টায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী শিক্ষিত, শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্ররা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালান।

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়

এ দেশের সাধারণ মানুষ ভাষার অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না। লেখক, বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় দেশ বিভাগের প্রাক্কালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের একটি সাধারণ পটভূমি সৃষ্টি হলেও এসময় সাধারণ জনগণের মধ্যে এ বিষয় সম্পর্কে সচেতনতার বড় অভাব ছিল।[৮] এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশিদ বলেন, "পূর্ব-পাকিস্তান ভাষা বিতর্ক বাদ দিলে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে দুটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায় হচ্ছে, ১৯৪৭-৪৮। এ সময়ে ভাষার প্রশ্ন বিতর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা প্রতিবাদ বিক্ষোভে রূপ নেয়। জিন্নাহর ঢাকা ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিবাদ মুখ্য ঘটনা। দ্বিতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায় হচ্ছে ১৯৫২। এ সময়ে সংগঠিত হয় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।" [৯]

তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা আবুল কাশেম বলেন– সকলেই কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত লোক খুব কমই ছিল। শুধু তাহাই নয়, তখন অনেকে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যভাবে উর্দুরই সমর্থক ছিলেন।[১০] কয়েকটা সংগঠন ভাষা আন্দোলনকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে খুবই কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে 'গণ আজাদী লীগ' অন্যতম। সংগঠনটি ১৯৪৭ সালে বামপন্থী কর্মীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ম্যানিফেস্টোতে দাবি করা হয়, 'মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান করিতে হইবে। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাকে দেশের যুগোপযোগী করিবার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাংলা হইবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা'।[১১] ১ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে 'তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠানটি যা ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে আলোচনার বীজ বপন করে। এ

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে অধ্যাপক আব্দুল কাশেম বলেন, "প্রাথমিক কর্মসূচিগুলোর মধ্যে ছিল ক্যাম্পাসসহ বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থনে সাহিত্য, সেমিনার ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করা। এসব সাহিত্য-সভা ও সেমিনারে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও ছাত্ররা অংশগ্রহণ করতেন।"[১২]

এ পরিস্থিতিতে বাংলার ছাত্র, যুবক, রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগিয়ে আসেন। তাদের উদ্যোগে এসময় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- গণ-আজাদী লীগ জুলাই ১৯৪৭, গণতান্ত্রিক যুবলীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৪৭), রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (১৯৪৭), পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮)। ভাষা আন্দোলনের এ পর্যায়ে এসব সংগঠন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। [১৩]

১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান জনগণের শতকরা হারের বিষয়টি নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

জনসংখ্যা	ভাষার হার
বাংলা ভাষার জনসংখ্যা	৫৬.৪০
পাঞ্জাবি ভাষার জনসংখ্যা	২৮.৫৫
পুশতো ভাষার জনসংখ্যা	৩.৪৮
সিন্ধি ভাষার জনসংখ্যা	৫.৪৭
উর্দু ভাষার জনসংখ্যা	৩.২৭
বেলুচি ভাষার জনসংখ্যা	১.২৯
ইংরেজি ভাষার জনসংখ্যা	০.০২
অন্যান্য ভাষার জনসংখ্যা	১.৫২
মোট =	১০০

পূর্ব বাংলায় মাত্র ৩.২৭% ভাগ লোক উর্দু ভাষায় কথা বললেও সেই উর্দুকেই পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ভাষা ও ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তার প্রস্তাব অনেক আলাপ-আলোচনার পর অগ্রাহ্য হয়। কারণ প্রস্তাবটি একজন হিন্দুর

Dhaka University Institutional Repository

কাছ থেকে এসেছে বিধায় মুসলিম লীগের সদস্যরা এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ পান। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ছাত্রসমাজ ও তমদ্দুন মজলিসের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা এসময় রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালাতে থাকেন। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান নিম্নোক্ত মত প্রকাশ করেন- একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনের যে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে তা নস্যাৎ করার জন্যই বাংলাভাষার প্রস্তাব করা হচ্ছে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে হিন্দু-মুসলিম বিভেদের একটি বিরাট চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করা হয়। অথচ বাংলা এদেশের অধিকাংশ মানুষের মুখের ভাষা। আবার সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকেও বাংলাই প্রথম। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এ পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান করে। উক্ত দিনে ছাত্ররা সেক্রেটারিয়েটের বাইরে সমাবেত হলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে এবং এতে কমপক্ষে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়।[১৪] সরকার পুলিশকে দিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়গুলোতে আন্দোলন আরো বেশি বেগবান হতে থাকে। এ অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৫ মার্চ ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে বসে আলোচনায় বসে ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইতোমধ্যে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদে অধিবেশন বসে। উক্ত অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়।

এরপর ছাত্রসমাজ ভাষার দাবি বাস্তবায়নের জন্য একত্রিত হয়। এসময় নাজিমউদ্দিন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে পূর্ব বাংলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। জিন্নাহ পূর্ববাংলা সফরে এসে ২১ মার্চ, ১৯৪৮ রেসকোর্স ময়দানে বলেন, "তিনি কোন মানুষকে, এমনকি সে যদি মুসলামনও হয়, সহ্য করবেন না। আরো বলেন, পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়"। জিন্নাহর এই ঘোষণায় উপস্থিত ছাত্র-জনতা কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। এরপর ২৪ মার্চ (১৯৪৮ সালে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি ঘোষণা করেন, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন আসলে পাকিস্তান শত্রুদের কারসাজি। তিনি আন্দোলনকারীদের "পঞ্চম বাহিনী" হিসেবে উল্লেখ করেন। এছাড়াও বলেন, "বাঙালিরা তাদের প্রদেশে সরকারি ভাষারূপে যে কোন ভাষা নির্বাচিত করতে পারে। কিন্তু পাকিস্তানের সরকারি ভাষা অবশ্যই হবে উর্দু। জিন্নাহর এ উক্তির তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে উপস্থিত গ্রাজুয়েটবৃন্দ নো, নো ধ্বনি উচ্চারণ করে।"[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

খাজা নাজিমুদ্দিন কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিভঙ্গ

১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব-বাংলার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব-বাংলা প্রদেশে ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা অথবা অধিকাংশের মাতৃভাষাগুলোতে বাংলা অথবা অধিকাংশের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন।[১৬] বিরোধী দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রস্তাবের সংশোধনী আকারে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেন।

পূর্ব-বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারিভাবে আলোচনার জন্য, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে দিন ধার্য করা হয় কিন্তু খাজা নাজিমউদ্দিন সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেন নি। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে কায়েদে আজম সিদ্ধান্ত দেবেন একথা বলে বিষয়টা নিয়ে কোন প্রস্তাব পাশ করেনি। যা ছিল চুক্তির লঙ্ঘন এবং এটা ছিল পার্লামেন্টারি সদস্যদের বিশ্বাসঘাতকতা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর লিয়াকত আলী খানের পূর্ববঙ্গ সফর

১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যু বরণ করেন। তার মৃত্যুর পর ভাষা আন্দোলনের গতিতে স্থবিরতা আসে। তবে লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এলে ছাত্ররা বিক্ষোভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের মধ্যস্থতায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে তাকে একটি মানপত্র দেয়া হয়। এই মানপত্রে সুস্পষ্টভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, গণপরিষদের ও কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বাংলাকে স্বীকৃতি দানের দাবি করা হয়। কিন্তু লিয়াকত আলী তার বক্তৃতায় ভাষা প্রশ্নে কোন বক্তব্য প্রদান করেন নি।[১৭]

আরবী বর্ণমালা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা

একদিকে ছাত্রদের বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন চলতে থাকে। অন্যদিকে বাংলা ভাষা বিরোধী সরকারি ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান সরকার নানাভাবে চেষ্টা করে পূর্ব বাংলায় জোর পূর্বক উর্দুভাষা চাপিয়ে দেয়ার জন্য। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষার লিপির পরিবর্তন করে আরবি লিপি (আসলে উর্দু বর্ণমালা) প্রবর্তন করার বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে।[১৮] এ প্রচেষ্টার *মূল প্রবক্তা* ছিলেন বাংলাদেশের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। তিনি করাচিতে শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনের ভাষণে বলেন, আরবী বর্ণমালা পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষাগত সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করবে। দ্রুত লিখন ও পঠনের পক্ষে সুবিধাজনক বলে আরবিকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। প্রদেশব্যাপী আরবী হরফ প্রবর্তনের কারণে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ শুরু হয়। এদিকে শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড কোন আলাপ আলোচনা না করে 'উর্দুভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যত উন্নয়নের উপায়' উদ্ভাবনের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করে। ১৮ এপ্রিল, ১৯৫০ সালে পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জেলায় ২০টি কেন্দ্রে আরবি হরফে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষা দেয়া শুরু করে ও এজন্য এই খাতে সরকারি বরাদ্দ অনেক বৃদ্ধি করে।[১৯] তাছাড়া পাঠ্যপুস্তক রচনাকারীদের পুরষ্কার প্রদান করা হবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে একটি বিবৃতি দেন। 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' নামে মৌলানা মুহাম্মদ আকরাম খানের সভাপতিত্বে পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত বাংলাভাষা প্রমিতকরণ, সহজীকরণ ও সংস্কার করণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কমিটি তাদের চূড়ান্ত রিপোর্টে বাংলা ভাষায় আরবি হরফ প্রচলনের চেষ্টা বিশ বছর স্থগিত রাখার সুপারিশ করে। ১৯৫০ সালে শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি কমিটি তাদের অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। এতে বলা হয় *পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু*। এই সুপারিশে গণতান্ত্রিক ফেডারেশন প্রস্তাব করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা ও উর্দু। এরপর পরিষদীয় আলোচনা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারির আন্দোলন এবং পরবর্তী অবস্থা

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারিতে সর্বাত্মক ধর্মঘটের ডাক দিলে ঢাকা জেলার ম্যাজিস্ট্রেট শামসুল হক কোরেশী সরকারের নির্দেশে ২০ তারিখে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেন। ২১ তারিখে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে। আব্দুল হালিমের সভাপতিত্বে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয়। এতে ভোটাভুটি হয় ১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার পক্ষে, বাকি ৪ জন ভঙ্গ পক্ষে ভোট দেন। ১৪৪ ধারা জারি করার অর্থ একসঙ্গে ৪ জনের বেশি লোকের সমাগম, মিছিল, শোভাযাত্রা করতে পারবে না, যদি করে তা হবে বেআইনি। যাহোক, ছাত্ররা, যুবলীগের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীরা ও ছাত্রনেতাদের কয়েকজন পৃথক পৃথক ভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার পক্ষে আব্দুল মতিন বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, "আজ ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না হলে ভাষা আন্দোলন তো বটেই, ভবিষ্যতে কোন আন্দোলনই ১৪৪ ধারার ভয়ে এগিয়ে নেওয়া যাবে না।" এসময় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, "আমরা কি পিছিয়ে যাবো" এসময়

Dhaka University Institutional Repository

আব্দুস সামাদ ১০ জন করে এক একটি ব্যাচ করার প্রস্তাব দেন এবং তা গৃহীত হয়। হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম দলটি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার জন্য বের হয়।"[২০] ভাষা আন্দোলনের প্রথমদিকে পুলিশ ছেলেদের গ্রেফতার করলেও মেয়েদেরকে গ্রেফতার করেনি। এরপর ছেলেরা দলে দলে বের হয়ে আসলে পরিস্থিতি অবনতি হতে থাকে। তখন পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে এসময় ছাত্ররা প্রাচীর টপকিয়ে মেডিকেল কলেজের হোস্টেলের গেটে জড়ো হয় এবং পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদস্যদের দিকে রওনার প্রস্তুতি নেয়।

পরিষদের অধিবেশন শুরুর কিছু পূর্বে ছাত্ররা সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা করে। এসময় কিছু ছাত্র-জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এ পর্যায়ে পুলিশ সমবেত-ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়ে। এসময় ২০ বছরের ছাত্র আব্দুল বরকত গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এরপর আরো কয়েকটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। নিহতেরা হলেন– সালাহুদ্দীন, আব্দুল জব্বার, রফিকউদ্দীন প্রমুখ। পুলিশের এ নির্মম গুলিবর্ষণের পর শিক্ষক, শহরবাসী, পরিষদের সদস্যরা আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। কন্ট্রোলরুম থেকে ছাত্ররা সরকারের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে থাকে। শপথ গ্রহণ করে এবং কালো পতাকা ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সকলকে অবহিত করা হয়। আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ বিকাল ৩.৩০ দিকে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন যে, "যারা আমাদের ভাবী আশা ভরসাস্থল, পুলিশের গুলিতে জীবন লীলা সাঙ্গ করেছে, সেই সময় আমরা এখানে বসে কাজ করতে চাইনা।"

একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের পরবর্তী ঘটনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচি অনুযায়ী ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদের জানাজা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সরকারের নির্দেশে পুলিশ শহীদদের লাশ ২১ ফেব্রুয়ারি রাতের আঁধারে হাসপাতালে থেকে সরিয়ে ফেলে। ঐ রাতেই সরকারি ব্যবস্থাপনায় শহীদদের দাফন করা হয়। (Government of East Bengal, B-Proceeding, Bangladesh National Archives political department publicity Branch, March, 1952 Proceeding no 123. Police Department, House Branch, Bundle no 124, November, 1952. Progs no 317, 18) এ ঘটনার পরদিন ছাত্ররা গায়েবী জানাজা পড়ে। জানাজার পরে ছাত্ররা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'খুনের বদলা চাই' ইত্যাদি বলে মিছিল করে। পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর নানাভাবে দমন-পীড়ন করে। দোকানপাট, বাজারঘাট সব বন্ধ থাকে। সচিবালয়ের কর্মচারীরাও শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন এলাকায় পুলিশের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করা হয়। একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের ফলে হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় গুলিবর্ষণের ফলে ঘটনাস্থলে একজন এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুজনসহ মোট তিন জনের মৃত্যু হয়।[২১] *সাপ্তাহিক দৈনিকে* বলা হয়, ৭ জন নিহিত ও তিন শতাধিক আহত ও ৬২ জন গ্রেফতার হয়েছে। *আনন্দবাজার* পত্রিকায় বলা হয় ৯ জন নিহত হয়েছে। বিভিন্নসূত্রে শহীদদের সংখ্যা বিভিন্ন রকম দেয়া হয়েছে। এর মূল কারণ ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী শহীদদের লাশ সরিয়ে ফেলে এবং ২২ ফেব্রুয়ারিতে গুলিবর্ষণের লাশও অপসারণ করে।

শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান কেন্দ্রিয় শহীদ মিনারে অবস্থানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার এর নকশা তৈরি করেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার শহীদ মিনারের অন্তর্নিহিত শক্তি ও নীরব চ্যালেঞ্জ মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ ২৬ তারিখ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ট্রাকে করে নিয়ে যায়। এসময় ছাত্রীদের পক্ষ থেকে শহরের বিভিন্ন স্থানে কুকুর, গুরু ও ছাগলের গায়ে সরকারের সমালোচনামূলক পোস্টার লাগিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষে কতগুলো প্রস্তাব পাশ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বর্ধমান হাউসে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নূরুল আমীনের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে এবং ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের ফলে নিহতদের স্মরণে দুঃখ প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।[২২]

২৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ উদ্ভুত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ১৯৫২ সালের ৫ ডিসেম্বর 'বন্দি মুক্তি দিবসে' শেখ মুজিবুর রহমান তার বক্তৃতায় বলেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে মাওলানা ভাসানীসহ বহু মানুষকে বন্দি করা হয়েছে। যা ইতিহাসে প্রথম। তিনি বন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি করেন। ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্ররা কার্জন হলে ও ঢাকা মেডিকেল হোস্টেলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। এ ঘটনায় পর আতিকুল ইসলাম, এনাম আহমেদ চৌধুরীসহ প্রায় ১০ জন ছাত্রকে রাসটিকেট করা হয়। যদিও পরে তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ঢাকার বাইরেও সারা পূর্ব-বাংলায় অসংখ্য স্থানে প্রথম স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

শহীদ দিবস পালিত হয়। এসব আন্দোলন-সংগ্রামের পরিণতিতে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি মেনে নেয়। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণ-পরিষদে পাকিস্তান ইসলামী রিপাবলিকের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। এ সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় "The State languages of Pakistan Shall be Urdu and Bengali. (The Constitution of the Islamic Republic of Pakistion, See, 214(i).

অতএব বলা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে হীন ষড়যন্ত্র করেছিল সেটিকে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা বাংলার ছাত্র-জনতার ওপর চরমমাত্রায় অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু বাঙ্গালীরা দমার পাত্র নয়। তারা কোনভাবেই এদাবি মানতে রাজি ছিল না। বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম শেষে ২১ ফেব্রুয়ারিতে বুকের তাজা রক্তের বিনিময়ে বাংলার দমার ছেলেরা ভাষার অধিকার ছিনিয়ে আনে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পাকিস্তান সরকারের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হয়। এ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত হয়। বাংলা মায়ের দমাল ছেলেরা সন্তানেদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য এর পরবর্তী বছর থেকে ২১ শে ফেব্রুয়ারি সারা বাংলায় শহীদ দিবস পালিত হয়ে আসছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা

১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজি ভাষার সাথে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে ছাত্রসমাজ ও তমদ্দুন মজলিসের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা এসময় বেশ জোড়ালোভাবে আলোচনা করতে থাকেন। এসব আন্দোলন-সংগ্রাম নারীদের মধ্যে মিসেস আনোয়ারা ও লিলি খানসহ অনেকে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা ভাষা আন্দোলনের সভা সমিতিতে জোরালো ভূমিকা রাখেন। ১১ মার্চ আন্দোলন ও পরবর্তী কয়েকদিনের আন্দোলনে ঢাকার স্কুল-কলেজের বহু ছাত্রী বাংলা ভাষার পক্ষে অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী কোজাদী মাহমুদা নাসিরসহ অনেকে বক্তৃতা-বিবৃতি দেন। নিখিল বঙ্গ মুসলীম লীগের মহিলা সংগঠনের সম্পাদিকা মিসেস রুকিয়া আনোয়ার একটি বিবৃতিতে বলেন যে, "পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা ভাষাকে অস্বীকার করায় সমগ্র পূর্ববঙ্গ ব্যথিত হইয়াছে। পাকিস্তানের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৬১ জন বাংলা ভাষাভাষী এবং ইহা সাড়ে চার কোটি লোকের মাতৃভাষা। সংখ্যাগুরুর মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশী ভাষা চালাইয়া দিয়া

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগুরুর প্রতি যে অত্যাচার করা হইল ইতিহাসে ইহার নজির নাই।" এভাবে বিভিন্ন প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় এবং বিবৃতি ছাড়াও বহু নারী চিঠিপত্রের মাধ্যমে বাংলা ভাষার পক্ষে তাদের মতামত প্রদান করেছেন।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি নাজিমুদ্দিনের বক্তৃতার পর পরিস্থিতি আরো খারাপ আকার ধারণ করে। ফলে ৩১ জানুয়ারি সর্বদলীয় সভা ডাকা হয়। সেখানে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, "বাংলা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে।"[২৩] এ সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয় এবং এর অন্যতম সদস্য ছিলেন মিসেস আনোয়ারা খাতুন (পূর্ব-পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য)।[২৪] দেশ বিভাগের আগে থেকে শুরু করে বিভাগোত্তর কালেও ভাষা প্রশ্নে নারীরা অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সরকারের দমন-পীড়নের কারণে ছাত্রদের অনেক সময় আন্দোলনের মুখোমুখি হওয়া কষ্টকর ছিল। তখনো নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে দেশ বিভাগের আগেও সাধারণ নারীরা রাজনৈতিক অধিকার সচেতন ছিলেন এবং তারা দেশ বিভাগের আগে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে নারীর সমঝতার প্রমাণ প্রদান করেন।

ভাষা আন্দোলনের তৎপরতাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য ১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি 'পতাকা দিবস' পালন করা হয়। এসময় ৫০০ টি পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেয়া হয় নাদিয়া বেগম ও শাফিয়া খাতুনকে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের ও অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।[২৫] ২১ ফেব্রুয়ারির হরতালকে সফল করার জন্য দুই সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতি চলে, সেখানেও মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন- লায়লা সামাদ, শামসুন নাহার, শাফিয়া খাতুন, সারা তৈফুর প্রমুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও ব্যাপকহারে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে নারীনেত্রী শরিফা বলেন–"এ জাতীয় আন্দোলনে ও ধর্মঘটের কাজে হোস্টেলের ছাত্রীরাই প্রধানত অংশগ্রহণ করেছিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর ছাত্রদের দু'তিনটি দল বাইরে বের হয়ে যাওয়ার পর পরই সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, সারা তৈফুরসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে রাস্তায় বের হয়।"[২৬] এভাবে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে মেয়েরা স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে মেয়েদের আহত হওয়ার ঘটনাটি মিসেস আনোয়ারা খাতুন

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে উত্থাপন করেন। তিনি বলেন–"এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই। ছেলেদের কথা আর নাই বললাম, যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানে না সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য।...যে Ministry-র আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়-যারা মাতৃজাতির সম্মান দেন না তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠিচার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে। ...মেয়েদের Total wounded এর সংখ্যা হল ৮জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে।"[২৭] পুলিশের গুলিবর্ষণের পর নারীরা সভা করে এর প্রতিবাদ করেন। ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি শাফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শহীদদের আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ ও নিন্দা জানানো হয় এবং সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয়।[২৮]

২৩ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আজিমপুর কলোনির মেয়েরা একটি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন এবং কমলাপুর ও দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েরা এসে তাতে যোগদান করেন। কয়েক হাজার নারী এই সভায় একত্রিত হয়ে সরকারের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।[২৯] ২৬ ফেব্রুয়ারিতে পুরানো ঢাকার অভয় দাস লেনে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নারীদের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় 'সর্বদলীয় ঢাকা মহিলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৩০] রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সঠিক ও সুষ্টভাবে পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসে নারী নেত্রীবৃন্দ ও ছাত্রীরা। সে সময় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেয়েরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে চাঁদা তোলেন এবং সবাই তাদের সাধ্যমতো সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

ভাষা সৈনিক মোসলেমা খাতুন এ বিষয়ে বলেন যে, "রাতে সিনিয়র জুনিয়র সব ছাত্রীরা এক সঙ্গে বসে আলোচনা করে ঠিক করা হলো আমরা দু'জন দু'জন করে শহরে গিয়ে চাঁদা তুলবো। "আমি আর সুফিয়া খাতুন বের হলাম একসঙ্গে। আমরা গেলাম শান্তিনগর আর মালিবাগ এলাকায়। সারাদিন বাড়ি বাড়ি চাঁদা তুললাম, যেখানে গিয়েছি, সেখানেই পেয়েছি ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি। অনেক বাড়িতে মহিলারা গুলিবিদ্ধ ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে আপনজন হারানোর মত কেঁদেছে।"[৩১] রাষ্ট্রভাষার প্রচার প্রচারণার জন্য ২১ ফেব্রুয়ারির আগে ও পরে প্রচুর পোস্টার লিখে ছাত্রীরা এ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনকে বেগবান করে। এ প্রসঙ্গে তৈফুরা বলেন, এস এম হলের ছাত্ররা কাগজ ও কালি দিয়ে যেতো, আমরা পোস্টার লিখতাম, 'নাজিমুদ্দিন গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান।

এরপর প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরীতে ছাত্র-ছাত্রীরা এতে অংশগ্রহণ করতো। প্রভাত ফেরীতে অংশ নেয়া ছাত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরিদা বারী মালিক, জহরুত সারা, খালেদা ফেন্সী খান প্রমুখ।[৩২] ১৯৫৩ সালে ইডেন কলেজ ও ঢাকা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির চেষ্টা করে যদিও অধ্যক্ষের বাঁধায় তা সম্ভব হয়নি। ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৩ সালে) কামরুননেসা গালর্স স্কুলের ছাত্রীরা তাদের স্কুল প্রাঙ্গণে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেন।[৩৩] ঐ দিন বিকেলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা করেন নারীনেত্রী হালিমা খাতুন।[৩৪] এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রভাবে ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা আন্দোলনের প্রচারপত্র বিতরণ এবং শোভাযাত্রায় বহু মেয়ে অংশগ্রহণ করে।

১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে পুলিশ বিভিন্ন ছাত্রাবাস থেকে নেতাদেরকে গ্রেফতার করে। ছাত্র-ছাত্রীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আওয়াজ তোলে। ঐ দিনের ছাত্রী গ্রেফতার সম্পর্কে প্রতিভা মুৎসদ্দি বলেন–

"১৯৫৫ সালে আমার সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা ছিল। সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় মিলিটারী ছেঁয়ে গেছে।...একজন ছাত্রনেতা বক্তৃতা করছিল, হঠাৎ সবাই দৌড়াচ্ছে। শুনলাম লাঠিচার্জ হচ্ছে। আমরা কলা ভবনের লাইব্রেরীতে ঢুকলাম, আমরা সাত জন- কামরুন নাহার লাইলী, ফরিদা বারী মালিক, হোসনে আরা আপা, লায়লা নুর ও আরো দু'জন। তখন আমরা এক সাথে বের হই। আমাদের উপর লাঠি চার্জ শুরু হয়। আমরা তখন মিছিল করি। আশপাশ থেকে ছেলেরাও আসতে শুরু করেছে। আমাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ভ্যানে উঠিয়ে লালবাগ থানায় নিয়ে যায়। সেখানে নাম ঠিকানা লিখে আমাদের সেন্ট্রাল জেল পাঠিয়ে দেয়া হয়।"[৩৫] ১৯৫৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস প্রতুষ্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ছাত্র-জনতা আজিমপুরে শহীদদের কবর জিয়ারত করেন। এসময় বহু মহিলাকে কালো কাপড় পরিহিত অবস্থায় কবর জিয়ারত করতে দেখা গেছে।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

নারীসমাজের এসকল কর্মকাণ্ড ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বিষযগুলো মূল্যায়ন করে বলা হয় যে, ভাষা আন্দোলনে নারীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। পরবর্তীতে অন্য সকল আন্দোলনে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাসহ বিভিন্ন স্তরের নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়ে আন্দোলনকে পূর্ণতা দিয়েছিল। ঢাকা ছাড়াও বিভিন্ন মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরেও এ আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। তাদের অংশগ্রহণের ফলে এ আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছিল। নাজুক সমাজ ব্যবস্থার এটা ছিল রাজনৈতিক সংস্কারমূলক প্রথম ধাক্কা। নারীরা অন্দর মহল থেকে বের হয়ে এ আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল- তা ছিল প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এরপর থেকে নারীরা পরবর্তীতে সংঘটিত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা শহরগুলোতে ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা

এপর্যায়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও জেলাগুলোতে ভাষা আন্দোলনে নারীরা যে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো-

নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকল দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও স্কুল বন্ধ করে নারায়ণগঞ্জবাসী ধর্মঘট পালন করেন। ছাত্ররা মিছিল করে। ২২ তারিখে নারায়ণগঞ্জ মিছিলের রাজধানীতে পরিণত হয়। চাষাড়ার মাঠে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় মর্গান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল শোভাযাত্রা সহকারে অংশগ্রহণ করেন।[৩৭] ভাষা আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের নারীদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মিছিল, সভা-সমাবেশ নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়াও আন্দোলন চালিয়ে নেয়ার জন্য শহরের গৃহিণীদের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সাহায্য করার বিষয়টি ভাষা আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিল। নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মর্গান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম। তিনি ফেব্রুয়ারির উত্তাল দিনগুলোতে প্রতিটি সভা সমাবেশে ও মিছিলে পুরোভাগে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। সেদিন সকালে স্থানীয় পুলিশ প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার করে। এর প্রতিবাদে স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে এবং রাজপথে বেরিয়ে এসে পথ অবরোধ করে অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা। শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণ কোর্ট এলাকায় হাজির হয়ে তার মুক্তি দাবি করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে শ্লোগান দিতে থাকে। তাকে বিনাশর্তে মুক্তি না দিলে জনগণ আদালত প্রাঙ্গনে ছেড়ে যাবে না বলে ঘোষণা দেয়। পুলিশ তাকে ভ্যানে উঠানোর চেষ্টা করলে জনতা তাতে বাধা দেয়। এতে পুলিশ জনতার ওপর হামলা চালায়। এসময় গ্রেফতার হয় ছাত্রী ইলা বকশী ও বেনু ধর। এছাড়াও আরোও ৪৪ জন নারী আহত হন। এমতপরিস্থিতিতে সরকারের নির্দেশে নিয়ন্ত্রণের জন্য নারায়ণগঞ্জে ৭ মার্চ থেকে সন্ধ্যা আইন বলবত থাকে।[৩৮]

অলি আহাদ এ প্রসঙ্গে বলেন," রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিবার কারণে অনেককে গুরুতর মাশুল দিতে হইয়াছে। কারাগার হইতে বণ্ড সহি করিয়া মুক্তি করিতে অস্বীকার করিলে মিসেস মমতাজ বেগমকে তাঁহার স্বামী তালাক দেন। এভাবে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যোগ দেয়ার জন্য তার সংসার তছনছ হয়ে যায়। আমরা তার মূল্যায়ন করতে সক্ষম হইয়াছি কি? জাতির কর্ণধারগণ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখাইয়াছেন কি?"[৩৯] এরকম বহু ঘটনা সাক্ষী ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি। সরকারের রক্তচক্ষু, জেল-জুলম কোন কিছু দমিয়ে রাখতে পারেনি।

খুলনায় ভাষা আন্দোলনে নারী

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে খুলনার যেসকল নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- আনোয়ারা খাতুন, রেবা, লুৎফুন নাহার, ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা হেলেন প্রমুখ।[৪০] ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে নেত্রীবৃন্দ স্কুলে স্কুলে ছাত্রদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানান। খুলনা করনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলের দেয়ালে বাংলা ভাষায় পক্ষে হাতে লিখে পোস্টার লাগান। খুলনা করনেশনের তৎকালীন একজন ছাত্রী বলেন, "স্কুল ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু কোথাও কালো কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না। লাইলী নামে একজন কালো কাপড় পরে এসেছিল। ছাত্রীরা তাকে অন্য শাড়ি পরতে দেয়। আর তার কাপড় কেটে কালো ব্যাজ ধারণ করে।" ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি পোস্টার লাগানোর জন্য পুলিশ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নামে মামলা করে। এ অবস্থায় বহু নারী প্রভাত ফেরীতে অংশ

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। ১৯৫২ সালের পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনেও খুলনার নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তারা এসব আন্দোলনে অংশ নেন।

চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনে নারী

'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এই দাবি সকল বিভাগীয় শহরের মতো চট্টগ্রামের মানুষও করেছিল। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি সারা শহরে পোস্টার লাগানো শুরু হয়। মিরা সেন, জাহানারা রহমান, জওশন আরা রহমান, হোসেন আরা সাক্ষী প্রমুখ চট্টগ্রামে পোস্টার লেখা ও লাগানোর কাজে জড়িত ছিলেন।[৪১] এ প্রসঙ্গে প্রতিভা মুৎসুদ্দি বলেন– 'আমি পোস্টার লিখতে পারতাম না। অন্যরা পোস্টার লিখত আর আমি সেগুলো দেয়ালে লাগাতাম। মিটিং মিছিলে বক্তৃতা দিতাম। এভাবেই চট্টগ্রামে আন্দোলন সংগঠিত করি। এই আন্দোলনে মেয়েরাও সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। সেই সময় মেয়েদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা ছিল অকল্পনীয়। তা সত্ত্বেও মেয়েরা নিজ উদ্যোগে মিছিলে অংশগ্রহণ করে।''

২২ ফেব্রুয়ারি চট্রগ্রাম শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছিল। সারা শহরে মিছিলের পর মিছিল চলতে থাকে। সেই মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তাগীর স্কুলের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পনাচরণ গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আরো কিছু মেয়ে তাতে অংশ নেয়। মেয়েদের একটা ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে, পায়ে হেঁটে মিছিলটি এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে সংগ্রামী জনতা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে।[৪২] ২৫ ফেব্রুয়ারি ছাত্রীরা একইভাবে আন্দোলন করতে থাকে। ছাত্রীরা গণপরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২৮ তারিখে হরতাল ডাকা হয়। ঐ দিন চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে মিছিল বের করে। মিছিলে 'মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দেয়া হয়। বিকেলে দশ সহস্রাধিক ছাত্রের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[৪৩] ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তালেয়া রহমান বলেন–"আমাদের সময়টা খুবই অন্যরম ছিল। আমরা পুরুষদের থেকে অন্যরকম, অন্যভাবে চিন্তা করি, এমন ধারণাই ছিল না। যারাই আন্দোলনে গিয়েছে তারাই পুরুষদের সাথে সমানে সামনে গিয়েছে। সুতরাং আমরা যে বেরিয়ে এসে একটি সাংঘাতিক কাজ করেছি এটি মনেই হয়নি। আমাদের বের হতে হবে, বেরিয়েছি, ব্যাস। আমাদের বাবা-মা চিন্তা করত, আমরা না।"[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামের আন্দোলন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চট্টগ্রামে সংগঠিতভাবে আন্দোলন হয়েছে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নিয়েছে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। নারীরা জনমত গঠন, পোস্টার তৈরি ও লাগানো, চোঙ্গা দিয়ে প্রচারণা, মিটিং, মিছিল প্রভৃতিতে অংশ নিয়ে আন্দোলনকে গতিশীল করেছে। পুরুষের সাথে নারীরা জড়িত হয়ে আন্দোলনে তাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, রাজপথে মিছিল-মিটিং করেছেন।

বরিশালের ভাষা আন্দোলন ও নারী সমাজের ভূমিকা

১৯৪৮ সালের পর থেকেই বরিশালে ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লাগে। বরিশালের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ জনতা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে সারা শহরে হরতাল পালন করে। জগদীশ স্যার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রাণী ভট্টাচার্য ঐ বিদ্যালয়ের মেয়েদের নিয়ে মিছিলে অংশ নেন। রানী ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেন, "১৯৫২ সালে আমি জগদীশ স্যার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি শিক্ষকদের বললাম ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দিতে, কিন্তু কেউই সাহস পায়নি। আমি মেয়েদের নিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। তখন সদর গার্লস স্কুল সরকারি হয়নি। সে স্কুলের কাছে মিছিল নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদেরকে স্কুল থেকে বের হতে দেয়নি। আমরা টাউন হল থেকে মিছিল করে কাঠপট্টি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। এগারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করেছি।"[৪৫]

২২ ফেব্রুয়ারি বরিশালে ছাত্র-জনতা ২১ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল বের করে। এতে পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল ব্যাপক। এছাড়াও গ্রাম থেকে আগত ছাত্র-জনতা ও শহরে শত শত ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। উক্ত মিছিলে নেতৃত্ব দেন মিসেস হামিদ উদ্দীন (সাবেক আওয়ামী লীগ দলীয় এম.পি)। মিছিলের অগ্রভাগে ছিল মেয়েরা পরে ছিল সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা। ভাষা আন্দোলনে বরিশালের নারীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ বরিশাল জেলা শাখার আহ্বায়ক আবুল হাশেম বলেন–এ আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা আসে। এখানে নারীগণ মূলত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয় ১৯৫২ সালে। তখন নারী-পুরুষ উভয়েই মিলিত হয়ে মিছিল করে। ইতোপূর্বে কখনোই বরিশালে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। ছাত্রীরা চাঁদা তোলার ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাসা-বাড়ী থেকে নারীদেরকে মিছিলে যোগ দেয়ার জন্য

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধকরণের কাজও তারা করেছেন। বরিশালে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- বেগম শামসুন্নাহার (মিসেস হামিদ উদ্দিন), হোসনে আরা বেগম (নিরু), আনজিরা বেগম, মঞ্জুশ্রী সেন, মাহেনুর বেগম (গোলানুর বেগম), মিসেস অবনিনাদ ঘোষ, মিসেস প্রাণ কুমার সেন, হালিম খাতুন, নুর জাহান প্রমুখ।

ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীর নারীদের ভূমিকা

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার দাবিতে রাজশাহীতেও হরতাল-অবরোধ চলে। জনসমাবেশ হয়। উক্ত সময় জাহানারা বেগম 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা আজ জেগেছে এই জনতা' এই গানটি পরিবেশন করেন।[৪৬] রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের প্রচারনায় মোহসেনা বেগম ও জেরিনা বেগম প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

২২ ফেব্রুয়ারির মিছিলে ব্যাপক সংখ্যক ছাত্রী অংশ নেয়। ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ সম্পর্কে আখতার বানু বলেন-"পি.এন.গালর্স স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মনোয়ারা আপা স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে মেয়েদের মিছিলে যাওয়ার জন্য জড়ো করতে লাগলো। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনে ক্লাস বর্জন করে মিছিলে শরিক হলাম..... শোভাযাত্রায় সামনে ভাইদের সাথে এক সারিতে নেত্রীদের হাতে থাকল উন্নত শোক পতাকা, কণ্ঠে আগুন ঝরা শ্লোগান 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' 'বরকতের খুন ভুলবনা, ভুলবনা' ইত্যাদি। .....পার্কের খোলা বাঁধানো মঞ্চে ছাত্র ভাইদের সাথে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন মনোয়ারা আপা, মোহসেনা আপা। বর্ম তীব্র ঝাঁঝালো সেই বক্তৃতার কথা।.....জাহানারা বেগমের কণ্ঠস্বর সকলকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একাকার করে তুলল।"[৪৭]

রাজশাহীতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ সম্পর্কে এডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক বলেন- নারীরা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করেছে এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তাদের বড় ভূমিকা ছিল তথ্য আদান-প্রদানে। তারা কুরিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। তাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রগতির স্বপক্ষে একটি বড় পদক্ষেপ। পরবর্তী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণে এটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।[৪৮] ভাষা আন্দোলনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল আশা ব্যঞ্জক। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মিত 'রাজশাহীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারীদের নামফলকে' যেসব নারীদের নাম রয়েছে তারা হলেন- রাজশাহী কলেজের জাহানারা বেগম, রাজশাহী

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলের মোহসিনা বেগম, জেরিনা বেগম ও কুলসুম বেগম এবং পি.এন. গালর্স স্কুলের মনোয়ারা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি, রওশন আরা খুকু। [৪৯]

এসব বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ভারত বিভক্তির সময় থেকে রাজশাহীর মানুষ আত্মসচেতন ছিলেন। সেই সচেতনতার ধারাবাহিকতায় রাজশাহীর নারীরা ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে নেমেছিলেন। নানাভাবে রাজশাহীর নারীরা আন্দোলনকে বেগবান করেছে। তারা অর্থসংগ্রহ, তথ্য আদান-প্রদান, মিটিং-মিছিল ইত্যাদিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। এ বিষয় গুলো তাদেরকে সচেতনতা ও প্রগতির পথে এগিয়ে নিতে সহায়তা করেছে।

সিলেটের ভাষা আন্দোলনে নারী

১৯৪৭ সালের ৩০ নভেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু হওয়া উচিত' এই বিষয়ে সিলেটে একটা সমাবেশ হয়। উক্ত সমাবেশে বহু ভাষাবিদ ড. সৈয়দ মুজতবা আলী প্রধান বক্তা ছিলেন। উক্ত সভায় পুরুষের পাশাপাশি সিলেটের নারীরাও উপস্থিত ছিলেন। বাংলা ভাষার সমর্থনে এটিকে দেশে প্রথম সমাবেশ রূপেও কোন কোন গবেষক অভিহিত করেছেন।[৫০] ১৯৪৮ সালে যানবাহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী আবদুর রব নিশতার সিলেট সফরে আসেন। তখন বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মুসলিম মহিলা লীগ এবং আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশন মন্ত্রীর সাথে দেখা করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি জানান।[৫১]

৮ মার্চের (১৯৪৮) সভায় পূর্ব নির্ধারিত সভাপতি ছিলেন বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী। কিন্তু সকালে তার স্বামী দেওয়ান আব্দুর রহিম চৌধুরী কোর্টে মুসলিম লীগের হামলার পরিকল্পনা জানতে পেরে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান। বন্দুক হাতে নিয়ে স্ত্রীকে বলেন, "তোমার জনসভায় যাওয়া চলবে না। গেলে আমি আত্মহত্যা করবো। এদিকে তাঁর বড় ছেলেও মা'র পা জড়িয়ে ধরে বসে থাকেন। তার পক্ষে জনসভায় যাওয়া সম্ভব হয়নি।"[৫২] ৮ মার্চের সভা সফল না হওয়ার কারণে পুনরায় সভা ডাকা হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ২ মাসের জন্য সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেন। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে অনিল কুমার সিংহ বলেন- ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদ হয়। এই মিছিলের বিশেষত্ব ছিল ছাত্রীরা মিছিলের পুরোভাগে আর ছাত্র-জনতা ছিল মিছিলের পেছনের সারিতে। সিলেটের রক্ষণশীল সমাজের মেয়েদের সাধারণত

Dhaka University Institutional Repository

মিছিলে বের হতে খুব কমই দেখা যায়। ভাবতে অবাক লাগে আজ থেকে ৩৭ বছর আগে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সিলেটের মেয়েরা রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সিলেটের রাজপথে নেমেছিল। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল, 'খুনের বদলে খুন চাই' 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই'

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে মুসলিম মহিলা লীগ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বরাবরে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করে। উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেন বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী (সভাপতি), সৈয়দ সাহারা বানু (সহ-সভাপতি), সৈয়দা লুৎফুন্নেসা বেগম (সিনিয়র সদস্য) ও সিলেটের শিক্ষায়িত্রী রাবেয়া খাতুন।[৫৩] সিলেটের নারী সমাজের এ কর্মকাণ্ডের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সিলেটের সাপ্তাহিক ইস্টার্ন হেরাল্ড পত্রিকায় বেগম জোবেদা রহিম সম্পর্কে অশোভন উক্তি ছাপা হয়। সৈয়দা নজিবুন্নেসা বেগম এর প্রতিবাদের একটা বিবৃতি দেন। মহিলা লীগের সভাপতিকে অভিনন্দন জানিয়ে তমদ্দুন মজলিসের সভাপতিও একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি নিন্মরূপ : আজ সত্যিই আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ ও গৌরব অনুভব করছি। সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি তা আপনারা করেছেন। উর্দুর সমর্থনে সিলেটের কোন কোন পত্রিকা জঘন্য প্রচার কাজ করেছে।[৫৪]

রাষ্ট্রের নানামুখী চাপ, দমন-পীড়ন ইত্যাদির পরও ২২ ফেব্রুয়ারিতে নারীরা মিছিল করে গোবিন্দ পার্কে সভা করেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মেডিকেল কলেজের ছাত্র নাইয়ার উদ্দিন এবং বক্তৃতা করেন বেগম জোবেদা রহিম চৌধুরী ও নেত্রীস্থানীয় ছাত্রীবৃন্দ। বিকেলে নারীদের আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় জিন্নাহ হলে। সিলেটের মতো একটি রক্ষণশীল সমাজে যেখানে সবসময় গভীর ধর্মীয় প্রভাব বিরাজমান ছিল, সেখানে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। যা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৫৫] নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন,"এক হিসেবে নারীরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। তাদের ভূমিকা অসাধারণ, সেই ১৯৪৮ সালে যখন নারীরা রাতে রাস্তায় হাঁটতো, দিনে কেউ হেঁটে বের হতো না, দিনে রিক্সায় চড়লে শাড়ি দিয়ে রিক্সা ঢেকে যেতো। সেই অবস্থায় আন্দোলন করা সিলেটের মতো জায়গায়, তা ছিল অসাধারণ ভূমিকা। তারা ১৯৪৮ সালে নাজিমুদ্দিনকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে যা তখন কোন পুরুষ সংগঠন করতে পারেনি। তাদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ তারা প্রকাশ করেছে। যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের ভূমিকায় সম্পর্কে বলা যায় যে, ধর্মীয় বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকেও সিলেটের নারীরা এগিয়ে এসেছেন। যে কোন বিভাগীয় শহরের চেয়ে বেশি সক্রিয় ছিলেন সিলেটের নারীরা। তারা সরকারের বিভিন্ন দফতরে চিঠি পাঠিয়েছেন, স্মারলিপি দিয়েছেন। যা তৎকালীন পুরুষরা করতে পারেননি।

ভাষা আন্দোলনে দেশের বিভিন্ন স্থানের নারীদের অবদান মূল্যায়ন

উপরি উল্লিখিত বর্ণনায় ভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন পর্যায়ের নারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা সবাই মিটিং-মিছিল করেছেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি পরিমাণে অংশ নিয়েছেন। ছাত্রীরা চাঁদা তুলেছেন, মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করেছেন, মিটিং-মিছিল করেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, পোস্টার লিখেছেন। ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমতলায় জড়ো করানোর ব্যাপারে ভাষা সংগ্রামী রওশন আরা রহমান বলেন, "আমি, হালিমা, কায়সার, সিদ্দিকী, সবাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। তখন মেয়েরা বিশেষ করে বকশী বাজার কলেজ (বর্তমান বদরুন্নেসা কলেজ), ইডেন কলেজ, মুসলিম গালর্স স্কুল, বাংলা বাজার স্কুল এসব স্কুলে আমরা গিয়েছিলাম, মেয়েদেরকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমতলায় জড়ো করেছিলাম।"[৫৭]

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে নারীরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য রাস্তায় নেমেছেন। সেদিন প্রথম দুটি দল (ছেলেদের) ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার জন্য রাস্তায় বের হওয়ার পর মেয়েরাও নেমেছিল। মেয়েদের ভূমিকা সম্পর্কে ভাষা সংগ্রামী রওশন আরা বাচ্চু বলেন, "সুফিয়া খান, সুফিয়া আলী, বেরী আপা, রোকেয়া আপাসহ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গোপন মিটিংয়ে যোগ দিয়েছি। মিটিং ছাড়াও আমরা বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে মেয়েদেরকে আন্দোলনে উদ্ধুদ্ধ করার কাজ করেছি। পোস্টার লিখতাম, নুরুন নাহার কবিরের হাতের লেখা খুব ভাল ছিল। তিনি পোস্টার লিখতেন। আমরা তাকে সাহায্য করতাম। পরবর্তী সময়ে চাঁদা তোলার কাজও করেছি।"[৫৮]

বিভাগীয় শহরগুলোতেও নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। এ সম্পর্কে মাহবুবুল আলম চৌধুরী বলেন মিরা সেন, জাহানারা রহমান, রওশন আরা রহমান, হোসেন আরা এরা চট্টগ্রামে পোস্টার লিখতো এবং লাগাতো। মেয়েরা বিভিন্ন স্থান থেকে চাঁদা তুলেছে এবং চোঙ্গা দিয়ে ভাষার দাবি প্রচার

Dhaka University Institutional Repository

করেছে।[৫৯] রাজশাহীতে প্রচারণা সম্পর্কে ভাষা সংগ্রামী গোলাম আরিফ টিপু বলেন, "রাজশাহীতে টমটম গাড়িতে করে প্রচারণায় মোহসেনা ও জেরিনা প্রধান ভূমিকা পালন করেন।"[৬০]

১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রতি বছর মেয়েরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এসময় ঢাকা শহর ছাড়াও বিভাগীয় শহরগুলোতেও নারীরা সক্রিয় ছিল। ১৯৫৫ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপনের সময় অনেক মেয়েকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে কারাবন্দি করা হয়। এ সম্পর্কে ভাষা সংগ্রামী হোসনে আরা হক বলেন, ".....তারা আমাদের এসকোর্ট করে নিয়ে গেল। পুলিশ ভ্যান দাঁড়ানো ছিল, তাতে আমরা অনেকগুলো মেয়ে উঠলাম। ১২/১৫ জনের মতো মেয়ে। আমাদের সরাসরি সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হল। সবার নাম আলাদা আলাদা লিখে ঢুকানো হল। প্রায় দু'সপ্তাহের মতো আমরা জেলে ছিলাম।"[৬১]

মূলত নারী-পুরুষের সামগ্রিক অংশগ্রহণের ফলেই ভাষা আন্দোলনে সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কোন পক্ষ এককভাবে অংশ নিলে হয়তো তা সফল হতে পারত না। এ সম্পর্কে ভাষা সংগ্রামী রওশন আরা রহমান বলেন– তখন মেয়েরা যারা ছিল সবাই যে মিটিং-মিছিল গিয়েছে তা কিন্ত নয়। তবে যারা মিটিং-মিছিলে যায়নি তারাও কিন্তু আন্দোলনের সঙ্গে ছিল। কেউই এর বিরোধিতা করেনি। সবার ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। বলতে হয় যে, তখন নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত জোরালো ছিল। তখন মেয়েরা চুপ থাকলে আন্দোলন এত বেগবান হতো না। মেয়েদের অংশগ্রহণের ফলে আন্দোলন সামগ্রিকতা পেয়েছে।[৬২]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, পূর্ব বাংলার জনগণের পাকিস্তান বিরোধী রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রামের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। এই আন্দোলনটি প্রথমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও পরবর্তীতে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এই আন্দোলনের সফলতা বাংলার মানুষকে মুক্তি সংগ্রামে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এই আন্দোলনে মূল ভূমিকা পালন করেছিল বাংলার ছাত্রসমাজ। উল্লেখ্য যে, এই ছাত্রসমাজের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নারী নেত্রীবৃন্দ ছিলেন- ফরিদা বারী, আনোয়ারা খান, লিলি খান, সুফিয়া খাতুন, লায়লা সামাদ প্রমুখ। গণপরিষদে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের উর্দু ও ইংরেজী ভাষার পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে এর প্রতিবাদে পূর্ব বাংলায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা-

Dhaka University Institutional Repository

সমিতিতে বাংলা ভাষার পক্ষে আনোয়ারা খান ও লিলি খান জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন। ১৯৫২ সালে নাজিম উদ্দিনের বক্তৃতার পর সর্বদলীয় সভায় মাহবুবা খাতুন (ইডেন কলেজের ছাত্রী) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য মেয়েরা রক্ত দেবে বলে উল্লেখ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীরা পতাকা দিবস পালন করেন এবং ৫০০এর বেশি পোস্টার লেখার দায়িত্ব পালন করেন। ২১ ফেব্রুয়ারিকে সফল করার জন্য লায়লা সামাদ, শামসুন নাহান, শাফিয়া খাতুনসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এর প্রস্তুতিপর্বে অংশ নেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সময় ছেলেদের তিনটি দল বের হওয়ার পর মেয়েদের কয়েকটি দল বের হয়। সেখানে ছিলেন সুফিয়া আহম্মদ, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন নাহার প্রমুখ। এসময় ৮ জন ছাত্রী আহত হন। ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শাফিয়া খাতুনের সভাপতিত্বে ছাত্রীরা সভা করে এবং 'মহিলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। মহানগরী ছাড়াও নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, সিলেট, চট্রগামে নারীরা মিছিল-মিটিং, জনসভা, হরতাল অবরোধ করে আন্দোলনকে বেগবান করেছেন। এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে সিলেটের মহিলা নেত্রী মুসলিম জোবেদা রহিম, সাহারা বানু, লুৎফুন্নেসা প্রমুখ স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের কাছে প্রেরণ করা হয়। ১৯৫৩ সালে শহীদদের স্মৃতিকে স্মরণ করার জন্য প্রথম প্রভাত ফেরীতে ফরিদা বারী মালিকা, জহরুত সাবা, খালেদা ফেন্সীসহ বহু ছাত্রী ও সচেতন নারীরা অংশ নেন। সর্বশেষ বলা যায় যে, বাংলার ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন ছিল একটি ল্যাণ্ডমার্ক ঘটনা। এ আন্দেলনের সফলতা না আসলে অন্য কোন আন্দোলন আলোর মুখ দেখত না। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবে পরবর্তীতে নারীরা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এসকল নারী নেত্রীবৃন্দের প্রতি আমার অনেক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২

২. আতিউর রহমান, *আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬

৩. হেলাল, বশীর আল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৫

৪. আতিউর রহমান, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৩৭

৫. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৬

৬. আতিউর রহমান, প্রাগুপ্ত, পৃ. ৩৭

৭. হক, আব্দুল, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ৯-১২

৮. হেলাল, বশীর আল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৯. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৬৩

১০. আব্দুল, কাশেম, *একুশের সংকলন* '৮০, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ১

১১. *আশুদাবি কর্মসূচী আদর্শ*, প্রকাশক : কামরুদ্দীন আহম্মদ, কনভেনারগণ আজাদী লীগ, পূর্ব পাকিস্তান পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৪৭, পৃ.২৩-২৪; উদ্ধৃত : উমর, বদরুদ্দীন, পূর্ব বাংলাায় ভাষা আন্দোলনও তৎকালীন রাজনীতি, প্রথম খণ্ড, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৮

১২. কাশেম, প্রিন্সিপাল আবুল, *সাক্ষাতকার*, কামাল, মোস্তফা, *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি, চট্টগ্রাম-ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩

১৩. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৬৪

১৪. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৮

১৫. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯০-৯১

১৬. উমর বদরুদ্দীন, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৮

১৭. হক, গাজীউল, *আমার দেখা আমার লেখা*, মেরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৭

১৮. কাশেম, মোঃ আব্দুল, 'বাঙালি মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার দ্বারা (১৯৪০-১৯৭০)', কোরেশী মাহামুদ শাহ সম্পাদিত, *আই.বি.এস জার্নাল* ১৪০৩:৪, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ,

Dhaka University Institutional Repository

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, পৃ. ১৭৪

১৯. উমর, বদরুদ্দীন, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২১৪

২০. হক, গাজীউল, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৫০

২১. *দৈনিক আজাদ*, ২২.২.১৯৫২

২২. উমর, বদরুদ্দীন, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৬৩-২৬৪

২৩. উমর, বদরুদ্দীন, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৫৫

২৪. আহাদ, আল, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৩১

২৫. হক, গাজীউল, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৪৪

২৬. মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬

২৭. *Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly*, 22nd February 1952, Vol-VII, p. 98

২৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৪.২.১৯৫২; বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৪৭

২৯. রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *একুশে ফেব্রুয়ারি*, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৩, পৃ. ২৩০

৩০. *দৈনিক আজাদ*, ২৭.২.১৯৫২

৩১. আব্দুল্লাহ, তুষার (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষা কন্যা*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬-৩৭

৩২. রেজা, লি. এম. তারেক, *একুশ: ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৫৬)*, স্ট্যাডার্ড চার্টার ব্যাংক, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৬৮

৩৩. *সাপ্তাহিক সৈনিক*, ২৭.২.১৯৫৩; রেজা, লি, এম তারেক, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৮৩

৩৪. *সাপ্তাহিক ইতেফাক*, ২৩.২.১৯৫৩

৩৫. হেলাল, বশির আল, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৬০৫

৩৬. হক, গাজীউল *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৭২

৩৭. *দৈনিক আজাদ*, ২২.২.১৯৫২

৩৮. *দৈনিক আজাদ*, ২২.২.১৯৫২

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. আহাদ, অলি, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৫৯৮

৪০. হালিম, মুহাম্মদ আব্দুল, *খুলনায় ভাষা আন্দোলন-১৯৪৮*, চিত্র প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪

৪১. চৌধুরী, মাহবুবুল আলম, *সাক্ষাৎকার*, ২৫.২.২০০৫ [সূত্রঃ মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, ভাষা আন্দোলন ও নারী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৪৩]

৪২. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯৪

৪৩. বার্ণিক, এম. এ., *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ*, এইচ ডেভলমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২১৫

৪৪. চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯৭

৪৫. বেগম, ফিরোজা, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৪৯-২৫০ [সূত্রঃ মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪]

৪৬. হক, মুহাম্মদ একরামুল, *রাজশাহী জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৮

৪৭. বানু, আখতার, *স্মৃতিচারণ : রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা*, [সূত্রঃ মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫]

৪৮. রাজ্জাক, এডভোকেট আবদুর, *সাক্ষাৎকার*, ১২.৮.২০০৫

৪৯. ভুবন মোহন পার্ক, রাজশাহী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

৫০. মানিক, আব্দুল হামিদ, *সিলেটের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি*, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১২৬

৫১. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১২৬

৫২. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩৬

৫৩. তাজুল, মোহাম্মদ, সিলেট, হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোার (সম্পাদিত), *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৫৮; Muhith, AMA., *State Language Movement in East Bangal 1947-1956*, UPL, Dhaka, 2008, p-38

৫৪. যুগভেরী, ৩.৪.১৯৮৯

৫৫. বশর, প্রফেসর আবুল, *সাক্ষাৎকার*, ৩১.০৫.২০০৫; [সূত্রঃ মোহাম্মদ হুমায়ন কবির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬]

৫৬. মুহিত, আবুল মাল আব্দুল, *সাক্ষাৎকার*, ৩০.৫.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. রহমান, রওশন আরা, *সাক্ষাৎকার*, ১৬.৬.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭]

৫৮. বাচ্চু, রওশন আরা, *সাক্ষাৎকার*, ১৭.৫.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১]

৫৯. চৌধুরী, মাহবুবুল আলম, *সাক্ষাৎকার*, ২৫.৫.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪]

৬০. টিপু, গোলাম আরিফ, *সাক্ষাৎকার*, ১২.৯.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫]

৬১. হক, প্রফেসর হোসনে আরা, *সাক্ষাৎকার*, ৩০.৮.২০০৮; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭]

৬২. রেহমান, রওশন আরা, *সাক্ষাৎকার*, ১৬.৬.২০০৫; [সূত্রঃ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর পারঙ্গমতা

ইংরেজরা ভারতবর্ষে দুইশত বছর ধরে শাসন করেছে। কিন্তু ব্রিটিশদের শাসন ব্যবস্থাকে এ অঞ্চলের জনগণ কখনো মনেপ্রাণে গ্রহণ করেনি। তাদের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বহু বছর ধরে এ দেশবাসীকে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে। এরই ধারবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তান আবার পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নামে দুটি অংশে বিভক্ত হয়। ধর্মকেন্দ্রিকতা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হলেও অর্থ-বাণিজ্য, ভাষা-সাহিত্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতির ব্যাপক পার্থক্য থাকায় দুদেশের জনগণের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা ক্রমান্বয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে। এর সর্বপ্রথম বহি:প্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। সেই আন্দোলনে নারীরাও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পুরুষের পাশাপাশি এই আন্দোলন ছিল পরবর্তী সকল আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। এরপর থেকে রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে নারীদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সলে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ, ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নারীদের সংশ্লিষ্টতা, ১৯৬৬ সালে ৬দফা দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। এর পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সে নির্বাচনে ৭ জন নারী সংরক্ষিত আসনে জয়ী হন। কিন্তু এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন লাভ করার পরও পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এরপরই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি। পাকিস্তান সরকার নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য ও রসদ জড়ো করতে থাকে। এসময় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছিল এবং সবার মধ্যে উত্তেজনা কাজ করছিল। ২৫ মার্চের কালরাত্রি বাঙ্গালী জাতির জীবনে ভয়ঙ্কর একটি অধ্যায়। পাকিস্তান সরকার ঐদিন রাতে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর উপর নির্বিচারে আক্রমণ চালায়। সেই আক্রমণে নারী ও শিশুরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হন। তারপর গর্জে ওঠে বাংলার মানুষ। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা সর্বাত্মকভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করে। আলোচ্য অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের নারীর অংশগ্রহণ ও পারঙ্গমতা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদে ও প্রাদেশিক পরিষদে ১৬৭ ও ২৯৮ টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ আওয়ামী লীগের সাতজন সদস্য সংসদীয় নারী আসনে নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪ টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনের সব কটিতে আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। জাতীয় পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাতজন এই সদস্য পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।[১]

নিম্নে ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলের (পূর্ব-পাকিস্তান)পরিসংখ্যান একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	আসন লাভ	ভোট প্রাপ্তি
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	৭২.৫৭
ন্যাপ (মস্কোপন্থী)	৩৬	-	১.৮৩
ন্যাপ (পিকিং পন্থী)	১৫	-	.৩০
ইসলাম পছন্দ দলসমূহ	৫১৫	১	১৭.৮৫
স্বতন্ত্র ও অন্যান্য	১৩৯	১	৭.৭২
সর্বমোট	৮৬৭	১৬৫	১০০

পাকিস্তানের দুই প্রদেশে দুই দল সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করায় নির্বাচন-উত্তর পরিস্থিতি বেশ জটিল আকার ধারণ করে। কেন্দ্রীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সব কয়টিতে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও এদেশীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পাকিস্তান সরকার কিছুতেই রাজি ছিল না। ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে শুরু হয় অসন্তোষ। ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের সেনা ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার হুকুম দেন। এর পরপরই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। এর মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর সে দিনই প্রথম বাংলাদেশ তার 'স্ব-শাসন জারি' করতে সক্ষম হলো।[২] ছয়দফার নির্বাচনী ইশতেহার নিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচন করে। ছয়দফা ছিল জনগণের ম্যান্ডেট। কিন্তু

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনের পর দুই প্রদেশের রাজনৈতিক দল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দুই মেরুতে অবস্থান করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে অনড় থাকে। তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো ছয়দফার প্রথম ও ষষ্ঠদফা মেনে নিতে রাজি হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন যে, যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার ছয়দফা পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। এদিকে ইয়াহিয়া খান পূর্ব ঘোষিত ১ মার্চের (১৯৭১) অধিবেশন স্থগিত করায় পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সে সময় দলে দলে মানুষ প্রতিবাদ-প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক দলের নেত্রীবৃন্দ ও কর্মীরা দল বেঁধে প্রতিরোধ-সংগ্রামে অংশ নেন। এর ফলে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সহমর্মিতার একটি বড় মেল বন্ধন তৈরি হয়। এর ফলে এদেশের সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধের এই প্রস্তুতি পর্বেই সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এসকল কর্মকাণ্ডে সংগঠিতভাবে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রাও ছিল উল্লেখযোগ্য।[৩] ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার নিন্দা করে মুসলিম ছাত্রী সংঘের সভানেত্রী শওকত আরা ও সাধারণ সম্পাদিকা শাহানা এক যুক্ত বিবৃতিতে অবিলম্বে অধিবেশন অনুষ্ঠানের দাবি জানান।[৪] 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা সংসদ' ৬ মার্চে নিরস্ত্র জনগণের উপর হামলার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রকাশ্য দাবি করে একটি বিবৃতি দেয়।

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেয়ার সময় দেশের ছাত্র জনতা-শ্রমিক, কৃষক, সংস্কৃতিকর্মী ও নারী সমাজের অংশগ্রহণের ফলে এই ভাষণ ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীরা এতে যোগ দেয়। মুনতাসির মামুন তাঁর *সেই সব দিন* বইয়ে লিখেছেন যে, দেশের ভেতরে মার্চ মাসে যখন শুরু হয় সংগ্রামের তীব্রতা, তখন ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জনসভা লোকে লোকারণ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক শোনার জন্য। তাঁরই জবানিতে, "এ সভায় অসংখ্য মহিলা এসেছেন বাঁশের লাঠি নিয়ে, বহুলোক এসেছেন তীর ধনুক নিয়ে যেন যুদ্ধ আসন্ন। দেখা গেলো মেয়েদের ভীড়ে একজন অশিক্ষিত মেয়ে মনোয়ারা বিবি নিজেই রচিত গান গাইছে: 'মরি হায় হায়, দুঃখের সীমা নাই/ সোনার বাংলা শ্মশান হইল পরান ফাইডা যায়।' দেশাত্মকবোধক ভাটিয়ালী গানও শোনায় মনোয়ারা বিবি।"[৫] বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণে অসংখ্য মহিলা দূর-দূরান্ত থেকে এসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু যেদিন পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন, সে দিনই নারীরা বুঝলেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে আর ঘরে বসে থাকা যায় না। সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী তখন তার বাড়ির সামনে মেয়েদের জন্য রাইফেল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মিসেস টি এন রশিদ মেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। সাহারা খাতুন অন্যদের সাথে মিসেস টি এন রশিদের কাছে তিন সপ্তাহের ট্রেনিং নেন। ২৩ মার্চ মরিচা হাউজ থেকে মেয়েরা মার্চপাস্ট করে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। সাহারা খাতুনের হাতে ছিল বাংলাদেশের পতাকা।[৬]

পরোক্ষভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পর থেকে নারীরা অনেক বেশি তৎপর ও দায়িত্বশীল হয়ে ওঠেন। তাঁরা নিজেরা প্রশিক্ষণ নিতেন এবং অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। তারা রাইফেল চালানো এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে মেয়েদেরকে সচেতন করতে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আপনাকে আগেই বলে দিয়েছি, কোন গোলটেবিল বৈঠক হবে না..... যারা আমার মা-বোনের কোল শূন্য করেছে, তাদের সাথে বসব আমি গোল টেবিল বৈঠকে?..... এবারের সংগ্রাম মুক্তিসংগ্রাম; এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"[৭] বঙ্গবন্ধু নারী সমাজের সংগ্রামী অংশগ্রহণকে সব সময় মূল্যায়ন করেছেন। দেশের সব জেলায় নারীদের একত্রিত করে কুচকাওয়াজ ও অস্ত্রের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলা হতে থাকে। এই কাজে নিবেদিত ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, আওয়ামী লীগ মহিলা শাখা এবং ছাত্রসংগঠনের ছাত্রী প্রতিনিধিরা। ঢাকায় কুচকাওয়াজ করতে নারীরা একত্র হতেন কোন দিন সেগুনবাগিচায়, কোনদিন ধানমণ্ডি গালর্স ক্লাবের মাঠে, আবার কখনো কখনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পলাশীতে, জিগাতলায়, রায়ের বাজারে, কলাবাগানে, গোপীবাগে, সূত্রাপুরে ও গেণ্ডারিয়ায়।[৮]

দেশের ক্রান্তিকালে নারীরা যে যেভাবে পেরেছেন, সেভাবে কাজ করেছেন। বিশেষ করে কিছু নারী সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদেরকে দক্ষ করে তুলেছেন। নারীরা দেশকে শত্রুমুক্ত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। মিসেস সারা আলী এক সাক্ষাতকারে বলেন, "সেগুনবাগিচার বাসার সামনে বড় মাঠে নিয়মিত লাঠি হাতে মহিলাদের কুচকাওয়াজ যখন হতো, ১৯৭১ সালের অসহযোগ সময়, তখন প্রতিদিন যোগ দিয়েছি, অনেক কাজের দায়িত্ব নিয়েছি। ৭০ বছর বয়সেও এদেশের প্রথম মুসলিম নারী রাজনীতিবিদ জোবেদা খাতুন যখন সভা-সমিতি ও কুচকাওয়াজে নেতৃত্ব দিতেন ১৯৭০-৭১ এর মার্চ মাসের উত্তাল দিনগুলোতে, তখন তাঁর উত্তরসূরি নারীরা সাহসে বলীয়ান হয়ে উঠতেন।"[৯] ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার প্রথম বিজয় দিবসে জোবেদা খাতুন জাতীয় পতাকা হাতে সেগুনবাগিচা এলাকার সবাইকে নিয়ে বিজয় মিছিলে নেতৃত্ব দেন।[১০] হোসনে আরা ইসলাম ইডেন কলেজের ছাত্রীসংসদের সহ-সভানেত্রী ও পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদের নেত্রী ছিলেন। তার বাড়িটি

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র আন্দোলনের দুর্গ হিসেবে গড়ে ওঠেছিল। সুফিয়া কামালের সাথে তাল মিলিয়ে হাঁটতে তরুণীরা হিমশিম খেতো এবং তিনি কর্মীদের বাড়িতে গিয়ে বোঝাতেন যে, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলা স্বাধীনতার অংশ। একাজে ৯০ ভাগ দায়িত্ব নারী সমাজকেই নিতে হবে। ৮ মার্চ থেকে ভবনে ভবনে কালো পতাকা উড়ানোর কর্মসূচি সফল করেছেন মেয়েরা ও মায়েরা। অবলীলায় তারা এক টুকরো কালো কাপড় সেলাই করে ছাদে টানিয়ে দিয়েছেন। মার্চের ৯ তারিখে সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। সেদিন বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উড়তে দেখা গিয়েছিল। নারীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়, এই কাজে নারী ও ছাত্র সমাজ পালন করেছিল প্রধান ভূমিকা।[১১]

নারীরা মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতির সময়ে নানা ধরণের কর্মকাণ্ড করেছেন। সে সম্পর্কে জহিরুল ইসলাম *একাত্তরের গেরিলা* গ্রন্থে বলেন, "ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয়েছে। ৭ মার্চ থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন এই ট্রেনিং শুরু করেছে। ছাত্রলীগ অনুরূপ একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। ঝিগাতলা থেকে ছয়টা ছেলে (আমি, দিলু আফজাল, গেশু, কামাল ও দুলু) এবং তিনটা মেয়ে (জাহানারা, রুবী ও খুকু) এই ট্রেনিংয়ে অংশ নিলাম। এর মধ্যে কামাল আমার ছোট ভাই, দশম শ্রেণির ছাত্র এবং জাহানারা আমার ছোট বোন, বদরুন্নেসা সরকারি কলেজের এইচ.এস.সি ছাত্রী। অন্য মেয়ে দুটো জাহানারার বান্ধবী। প্রতিদিন নয়টা থেকে বারোটা পর্যন্ত ট্রেনিং হচ্ছে। ট্রেনিং বলতে মার্চপাস্ট, পিটি ও প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি। আমরা কাঠের ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং নিচ্ছি। ডামি রাইফেল হাতে নিয়ে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছি। মেয়েদের ট্রেনিং মূলত প্রাথমিক চিকিৎসা ও জরুরি ব্যবস্থা মোকাবেলা ওপর হচ্ছে। পিটি ও কুচকাওয়াজের পর আমরা জরুরি অবস্থা মোকাবেলার ওপর আলোচনা করছি। আলোচনার বিষয়বস্তু- যদি আমরা আর্মির দ্বারা আক্রান্ত হই, তবে শহরের পাড়া-মহল্লার মানুষকে কিভাবে রক্ষা করা যাবে? পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কি করতে হবে? কী করে মানুষকে সাহায্য করতে হবে? যদি পাড়া বা মহল্লাগুলো অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তবে কী করে মানুষের খাবার, পানি, ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।"[১২]

যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যুদ্ধ আক্রান্ত এলাকা কিভাবে সামলাতে হবে ? জনগণকে কিভাবে সেবা দিতে হবে? গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা না থাকলে সে অবস্থা কেমন করে সামলাতে হবে। এ জাতীয় বিষয়গুলো নারীদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। এ বিষয়ে মাহফুজুর রহমান লিখেছেন, "৯ মার্চ চট্টগ্রাম জে এম সেন হলে মহিলা আওয়ামী লীগের সভা হয়। এতে বক্তব্য দেন মেহেরুন্নেসা, বেগম সাফায়াত উল্লাহ,

Dhaka University Institutional Repository

বেগম নাজনীন, বেগম কামরুন্নাহার, বেগম মুছা খান, কুন্দপ্রভা সেন প্রমুখ। ১২ই মার্চ চট্টগ্রাম মহিলা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগ শহরে লাঠি মিছিল হয় ও আপওয়ার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়"।[১৩] ১৮ মার্চ সংসদের সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভাপতিত্বে নার্সিং স্কুলের ছাত্রদের উদ্যোগে স্বাধিকার আন্দোলনের বীর সেনানীদের হত্যার কারণে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী বেগম হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালের খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা প্রমুখ বক্তব্য দেন। ১৮ মার্চ চট্টগ্রামের জে এম সেন হলে মহিলা পরিষদ ও মহিলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক সভা হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উমরতুল ফজল। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সুফিয়া কামাল ও বিশেষ অতিথি ছিলেন মালেকা বেগম। এছাড়াও এ সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন-হান্নানা বেগম, সীমা চক্রবর্তী, দিল আফরোজ খান, জাহানারা আতুয়ার, আরতি দত্ত, ননী রক্ষিত, নুরুন্নাহার জহুর, রমা দত্ত, কুন্দপ্রভা সেন, মুশতারী শফী প্রমুখ। [১৪]

এসব নারীনেত্রীরা ২১, ২২ মার্চ স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল, মিটিং ও সভা করেন। জনগণকে বিশেষ করে নারীদের সচেতন করতে থাকেন। তারা নারীদেরকে সংগ্রামের জন্য যেকোন উদ্ভুত্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এ অবস্থাকে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সুদৃঢ় মানসিক শক্তির প্রযোজন ছিল। তাই নারীদেরকে প্রশিক্ষণ ও আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ্য করা হতো। ২৩ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সমস্ত দেশব্যাপী বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ডাক দিয়েছিলেন। প্রতিটি বাড়ির শীর্ষে কালো পতাকার সাথে স্বাধীন বাংলার নতুন পতাকাও উড়তে থাকে। পল্টন ময়দানে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে ১০ প্লাটুনবিশিষ্ট জয় বাংলা বাহিনী এবং ১ প্লাটুন ছাত্রী ছিল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ডামি রাইফেল।[১৫] ছাত্রলীগের তৎকালীন নেত্রী ফোরকান এ প্রসঙ্গে বলেন-২৩ মার্চ আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ বাহিনী পাকিস্তানের বুকে পাকিস্তান ডে-র বিপরীতে 'স্বাধীন বাংলাদেশ ডে' পালন করি। মেয়েদের মধ্যে শামসুন্নাহার টুকু পতাকা হাতে প্যারেডের সামনে থাকে, তারপর আমি, সাকী আপা, কাওসার, ঝুনুসহ অন্য মেয়েরা। আমরাই প্যারেডের নেতৃত্ব দেই। আমাদের অনুসরণ করে ছেলেদের দল।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

২৩ মার্চের ঘটনা

২৩ মার্চ (১৯৭১) এর প্রতিরোধ দিবসের প্রস্তুতি ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে জাহানারা ইমাম বলেন, "আজ প্রতিরোধ দিবস। খুব সকালে বাড়িশুদ্ধ সবাই মিলে ছাদে গিয়ে কালো পতাকার পাশে আরেকটা বাঁশে ওড়ালাম স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা। বুকের মধ্যে শিরশির করে উঠল। আনন্দ, উত্তেজনা, প্রত্যাশা, ভয়, অজানা আতঙ্ক-সবকিছু মিলে একাকার অনুভূতি।"[১৭] বাংলার পতাকা উঠেছে। সেই পতাকা উড়াকে স্তব্দ করার জন্য ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত নয় মাস হানাদারেরা হানা দিয়েছে। এই হানাদারদের প্রতিরোধ করার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীরা এগিয়ে এসেছে। তারা শহর থেকে গ্রামে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায় ছুটে বেড়িয়েছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদের কাজ সারা বাংলাদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, সিলেট, দিনাজপুর, বগুড়াসহ আরো বহু জেলায় বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে ১৯৭১ সাল পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদের শাখা গড়ে উঠেছিল। মনোরমা বসু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বরিশালে। তার সাথে ছিলেন পুষ্পনজা রানী ভট্টাচার্য, সুফিয়া ইসলাম, সাজেদা মবিন, কৃষ্ণা চন্দ, ইলা চন্দ্র প্রমুখ। উমরতুফ ফজল নেতৃত্ব দিয়েছেন চট্টগ্রামে। তার সাথে ছিলেন মুশতারী শফী, নূরজাহান খান, হান্নানা বেগম, দিল আফরোজ দিলু, গীতা ঘোষ, চিত্রা বিশ্বাস, রমা দত্ত, সীমা চক্রবর্তী প্রমুখ। পাবনার নেত্রী ছিলেন রাবিবা খাতুন। ঈশ্বরদীতে মিসেস জসিম মণ্ডল, সিলেটে উষাদাম পুরকারস্থ, খোদেজা কিবরিয়া, কুমিল্লায় সেলিনা বানু, মজিরুন্নেসা, রাজিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, নুরুন্নাহার বেলী, সুমিতা নাহার প্রমুখ। নারায়ণগঞ্জে নেতৃত্ব দেন হেনাদাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন নাজমা রহমান, জোবেদা, দীপা, লক্ষ্মী চক্রবর্তী প্রমুখ। নরসিংদীতে নেতৃত্ব দেন ভূমিকা চ্যাটার্জি, গৌরি নাহা ও ফওজিয়া পারভিন।[১৮] বহু নবীন, প্রবীণ নারীরা দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য একত্রে কাজ করেছেন। সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বহুজেলায় নারীরা ঝটিকা সফরে বের হন। যেসকল নারী নেত্রীরা তৎকালীন রাজনীতির কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন- নুরজাহান মুরশিদ, বেগম বদরুন্নেসা, সাজেদা চৌধুরী, আইভি রহমান, মমতাজ বেগম, ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী প্রমুখ।

পাকিস্তানি বাহিনী ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সকাল থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বাংলার নিরীহ জনতার ওপর স্বশস্ত্র আক্রমণ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে বলেন, "আমি সৈয়দপুর, রংপুর ও জয়দেবপুরের সামরিক অভিযানের সংবাদ জানতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরে মর্মাহত হয়েছি। বেসামরিক জনগণের ওপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও নির্যাতনের সংবাদ আসছে, পুলিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এক এাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। চট্টগ্রাম থেকেও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের সংবাদ আসছে। এসব কিছু ঘটেছে যখন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ঢাকায়....। আমি তাঁকে অবিলম্বে এরূপ সামরিক অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা জেনে রাখা উচিত যে, নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা ও বর্বরতা বিনা চ্যালেঞ্জে যেতে দেওয়া হবে না। আমার আস্থা আছে যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানেরা তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য 'বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি জন্য' সর্বপ্রকার পরিস্থিতির মোকাবেলায় প্রস্তুত।"[১৯] (১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা টেলিভিশন ও বেতারকেন্দ্র থেকে সান্ধ্য অধিবেশনে সম্প্রচারিত সংবাদ বুলেটিন)

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিকে নারীর অবস্থান

পৃথিবীর ইতিহাসে ২৫ মার্চের কালরাত একটি বিভীষিকাময় রাত। পাকিস্তান বাহিনী কোন ঘোষণা না দিয়েই নিরস্ত্র জনগণের উপর রাতের আঁধারে আক্রমণ করে। পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের যে গগণবিদারী আত্মচিৎকার শুরু হয় তার রেশ দীর্ঘ নয়মাস পর্যন্ত চলে। এ সম্পর্কে সুকুমার বিশ্বাস বলেন, "উনিশ শ' একাত্তরের পঁচিশ মার্চের রাত। বাংলার বুকে নেমে আসে অত্যাচার, উৎপীড়ন, পাশবিকতা, নৃশংসতা আর হিংস্রতার কালো থাবা। ...রাতের আঁধারে কাপুরুষের মতো বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরপরাধ জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো চরম নৃশংসতায়। যুদ্ধের সকল নিয়মকানুন উপেক্ষা করে তারা মেশিনগান, মর্টার আর ট্যাঙ্ক নিয়ে বর্বরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলো।"[২০] ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, নারী প্রতিনিধিসহ আরো অনেকেই ছিলেন। তারা কেউ জানতেন না যে রাতে ঢাকায় আক্রমণ করা হবে। কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় সবাই ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধুর আত্মগোপন প্রয়োজন। কিন্তু তিনি আত্মগোপনে যেতে রাজি হননি। পূর্ব সিদ্ধান্তে অটল থেকে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন–"আমার কাছে সব খবর আছে। ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছাড়ার পরই আক্রমণ শুরু হবে। আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে হানাদারেরা আমার জন্য ঢাকা শহরের সকল লোককে হত্যা করবে। আমার জন্য আমার জনগণের জীবন যাক, এটা আমি চাই না।"[২১] ২৫ শে মার্চ মধ্যরাতের পর বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনী তার বাসা থেকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পূর্বে (২৬মার্চ) তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৬ মার্চ এম.এ. হান্নান এবং ২৭ মার্চ তৎকালীন সেনাবাহিনীর মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। এরপর মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন বাংলার সর্বস্তরের জনগণ। ১০ এপ্রিল(১৯৭১) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে মুজিব নগর সরকার গঠন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধুর ২৬ মার্চের ঘোষণাটি অনুলিপি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এ স্থানই ছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী। জাহানারা ইমাম বলেন, "মুজিবনগর বলে একটা জায়গায় গত ১৭ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। ১০ তারিখেই নাকি এই প্রবাসী সরকার গঠিত হয়, আকাশবানী, বিবিসি থেকে সে খবর আগেই জানা গেছে।"[২২] তবে মুজিবনগর সরকার গঠনের সময় কোন নারী সদস্যকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপদে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, ৪ জন মন্ত্রী, ও সেনাপ্রধান নিয়োগ দেয়া হয়। সেখানের সবাই ছিলেন পুরুষ কিন্তু কোন নারী সদস্য ছিলেন না। এমন কি কাউকে সরকারের কোন দপ্তরের প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় নি।[২৩]

এ সময় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ও ৬৪টি সাব-সেক্টরে ভাগ করা হয়। কর্ণেল ওসমানিকে প্রধান সেনাপতি করে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেয়া হয়।। সেনাবাহিনীকে তিনটা ফোর্সে ভাগ করা। (১) 'কে' ফোর্স-মেজর খালেদ মোশারফ (২) 'জেড' ফোর্স-মেজর জিয়াউর রহমান (৩) 'এস' ফোর্স - মেজর একে এম শফিউল্লাহ। পুলিশ, ই.পি.আর ও সেনাবাহিনীর ট্রেনিং প্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে গঠিত হলো মুক্তিফৌজ। গেরিলা বাহিনী বা অনিয়মিত বাহিনী যা রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক ও দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে গঠিত হয়। তবে নারীদের ট্রেনিং দেয়া, গেরিলা যুদ্ধ করা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাজ করার বিষয়ে মুজিবনগর সরকার কোন নীতি নির্ধারণ করেনি। তবে এর অন্যতম কারণ ছিল এসকল বিষয়ে মনযোগ দেয়ার মতো অবস্থা সরকারের ছিল না। কিন্তু নারী সমাজ সরকারি স্বীকৃতি বা মনোনয়ন বিষয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করার প্রযোজনীয়তা বোধ করেনি। তারা নিজেদের উদ্যোগই যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পদ্মপুকুর ও পার্কসার্কসের মধ্যবর্তী এলাকার কাছাকাছি গোবরা এলাকায় মুজিবনগর সরকার অনুমোদিত একমাত্র মহিলা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছিল, যা গোবরা ক্যাম্প নামে পরিচিত ছিল। এখানে প্রায় ৪০০ জন নারী মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

কলকাতায় নারীরা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেও তাদের কর্মকাণ্ড প্রকাশিত হয়নি। নারীরা অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিলেও যুদ্ধে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেননি। যুদ্ধে নারীদেরকে অংশগ্রহণ করানোর ব্যাপারে সরকার দৃঢ় সংকল্প দৃষ্টিগোচর হয়না। নাারীদেরকে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে পাঠানোর কোন সিদ্ধান্ত সরকারের ছিল না। সেসময় প্রায় ৩০০ জন তরুণী ও কিশোরী রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিকভাবে গোবরা ক্যাম্পে অবস্থান করেছিলেন। সেসময় তারা যুদ্ধ করার জন্য অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অস্ত্র চালানো শিখলেও তাদের যুদ্ধে যাবার কোন অনুমতি ছিল না। সংগ্রামী যোদ্ধা মেয়েদের জন্য তৎকালীন সংসদ সদস্য সৈয়দ সাজেদা চৌধুরী 'গোবরা ক্যাম্প' চালু করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "মা-বোনদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গের পার্ক সার্কাসের গোবরা এলাকায় মহিলাদের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প গঠন করা হয়। আর এই ক্যাম্প পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল আমাকে। এই ক্যাম্পে সিভিল ডিফেন্স, নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এছাড়া দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন চলত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ শেষে নারীরা কেউ সরাসরি যুদ্ধ করেছেন, কেউ সেবা দিয়েছেন, কেউ মুক্তিযুদ্ধের তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা রেখেছেন, কেউবা জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।"[২৫] আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড গঠন করা হয়। সেখানে আধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এই দলের প্রধান ছিলেন ফোরকান বেগম।

নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট নারী মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধের প্রস্তুতি ও যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

গীতা মজুমদার

গীতা ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের মেয়ে, তিনি কোলকাতায় এলেন। তখন তিনি দেশের জন্য কিছু করার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু জানতেন না কিভাবে, কি করবেন? এসময় ফরিদপুরের স্কুল শিক্ষক রবীন্দ্র ত্রিবেদীর সাথে তার দেখা হয়। শিক্ষক গীতাকে বলেন, আমরা মেয়েদের নিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করছি। এই ধরো মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দেয়া এবং ফাস্ট এইড ট্রেনিং দিয়ে ফিল্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা নিয়েছি। একথা শোনার পর গীতা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চাইলে তার পরিবার আপত্তি করে। তারপরও তিনি প্রশিক্ষণে যোগ দেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সংসদ সদস্য সাজেদা চৌধুরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে নারীদেরকে ফিল্ডে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। গীতাসহ অন্য মেয়েদের মধ্যে থেকে ৫০ জনকে বাছাই করে ফাস্ট এইড প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তখন তারা সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণ নেন। তাদের মধ্যে থেকে ১৬ জনকে নার্সিংয়ের জন্য পাঠানো হয়। সেখানে গুপ্তাখালীতে ইন্ডিয়ান আর্মিদের নার্সিংয়ের জন্য তাদের পাঠানো হলো। পরে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাদান করেন। এসময় একদিন বিশ-ত্রিশজনের একটি মুক্তিযোদ্ধা দল অপরেশনে যাওয়ার পথে ট্রাক উল্টে দুর্ঘটনায় পড়ে। তাদেরকে ক্যাম্পে আনা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড, টোটা ভর্তি বন্দুক, মেশিনগান বাস্ট হয়েই আহত হয়েছিলেন। গীতারা তাদেরকে নার্সিং করেন।

তখন মুক্তিযোদ্ধাদের স্পিরিট, ইমোশন যা ছিল তা অবাক করার মতো। একজনের দুটো চোখ চলে গেছে, তবু বলছে, "আমার চোখ লাগবে না, আমাকে কোন রকমে ফ্রন্টে পৌঁছে দিন, আমি ঠিক যুদ্ধ করতে পারবো।" একজনের পা নেই, কারোর হাত নেই, কারোর মুখটাই ঝলসে গেছে, সবারই কথা, "আমাকে ফ্রন্টে পৌঁছে দিন।' মেয়ে হিসেবে মনের যে দুর্বলতা ছিল তা কেটে গেলো। এই ক্যাম্পে তিনি ১৬ দিন অবস্থান করেন। পরে সেখান থেকে চলে আসেন। তিনি বাংলাদেশের হাসপাতালে কাজ করতে পেরে খুশি হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইরা, অনিলা, লক্ষ্মী, শোভা, শেফালী, অঞ্জলি, যূথিকা আন্নাসহ অনেকে।

গীতা কর

গীতা কর ছিলেন রাজবাড়ীর মেয়ে। তখন তার বয়স ১৫ বছর। দেশব্যাপী হত্যা, লুটতরাজের সময় তার বাবাকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে। এই ঘটনায় পর তারা কয়েক বোনসহ ভারতে চলে আসেন। ভারতে আসার পর তাদের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পাকিস্তানী বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করবেন। সেসময় তিনি মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখান। প্রশিক্ষণের জন্য ২ জুলাই, ১৯৭১ সালে ক্যাম্পে যোগ দেন। তিনি গেরিলা যুদ্ধের কৌশল ও প্রাথমিক চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ নেন।

Dhaka University Institutional Repository

তার সাথে প্রায় ২০০ জনের অধিক নারী প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যারা প্রত্যেককে কাউকে না কাউকে হারিয়েছেন। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য বলা হলো। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১৫ জন মেয়েকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু তাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সাথে পাঠানো হলো, সেই ব্যক্তি তাদের ভাষা বোঝে না। তখন সেই আগন্তুক গীতাকরদের মাঝ রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় তারা অজানা-অচেনা পথে চলতে থাকেন। অবশেষে টানা ১০ দিন অভুক্ত অবস্থায় চলার পর সিলেট বর্ডারে এসে পৌঁছালে তাদেরকে 'গুপ্তচর' ভেবে ভারতীয় সৈন্যরা আটক করে। পরে ভারতীয় সৈন্যরা তাদের সঠিক পরিচয় জানতে পেরে আশ্রয় দেন। দীর্ঘযাত্রা পথের ক্লান্তিতে তারা ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। সেখানে থেকে সোমনাথ নামের এক ব্যক্তি তাদেরকে আগরতলায় পৌঁছে দেন। তারা আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের ৪৮০ বেডের একটা হাসপাতালে সেবা-শুশ্রুষা করতে থাকেন।

গীতা করের ভাষায় 'শুশ্রুষা করার সময় অপরিচয়ের বাঁধন কখন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, তা নিজেও জানতে পারলাম না। মনে হতো, যুদ্ধে আহত হয়ে ওই যে হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছে, ওটি আমার ভাই।' এই হাসাপাতালে আরো ছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডা. সিতারা বেগম, ডা. নাজিউদ্দিন আহমেদ, ডা. মোবিন, কবি সুফিয়া কামালের কন্যা সাঈদা কামাল ও সুলতানা কামাল, পদ্মাসহ ও আরো অনেকে। ১৬ ডিসেম্বরের পর তারা দেশে ফিরে আসেন।

শিরীন বানু মিতিল

শিরিন বানু মিতিল রাজনৈতিক পরিবারে বেড়ে উঠেছিলেন। তার মা সেলিনা বানু ছিলেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের এম.পি.। বাবা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতা। তিনি ১৯৭১ সালে ৭ মার্চের ভাষণ শোনার পর ছেলেদের সাথে রাস্তায় নেমে পড়েন এবং ব্যারিকেড তৈরি করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ছিলেন পাবনাতে। তবে ২৫ মার্চে পাকিস্তান বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের পর যুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। এসময় তিনি নারী পরিচয় বাদ দিয়ে পোশাক, চুলের কাটিং পরিবর্তন করে ছেলেদের রূপ ধারণ করেন। তার এ পরিচয়টা কাছের দুই একজন ছাড়া অন্যরা জনতেন না। তার ভাষায়, আমি যে মেয়ে এই কথাটি তখন মাত্র দুইজন ব্যক্তি জানতো এবং তারা বিশ্বস্ততার সাথে এই সত্যটি গোপন রেখে ছিলেন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে। পাবনার ছাত্র আন্দোলনের জেলা সভাপতির সঙ্গে যাওয়ার সময়

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, 'ও কি মিতিলের ছোট ভাই? বেশভুষা দেখে আমাকে ছেলে ছাড়া মেয়ে কল্পনা করা সেসময় একেবারেই অসম্ভব ছিল।'

ছেলে পরিচয়ে তার কাজ করতে সুবিধা হত। তারা নিরাপত্তার কারণে ও নিজেদের শক্তি সঞ্চিত করার জন্য খুলনার দিকে পা বাড়ান। প্রথমদিকে তার কাছে রাইফেল আসতে থাকে, তিনি রাইফেল নিয়েই বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। এরপর ডিউটি করেন কন্ট্রোল রুমে, তখন ডিসি ছিলেন জনাব কাদের। ৯ এপ্রিল পর্যন্ত কন্ট্রোলরুমে ডিউটি করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তত্ত্বধান করা ছিল তার কাজ। এদলে নারী হিসেবে নয়, পুরুষ হিসেবে কাজ করেছেন। 'ছেলেদের কাজ করার সময়, এমনকি বিশ্রামের সময়, ছেলেদের পাশে ছেলে হিসেবে থেকেছি ও ঘুমিয়েছি। কেউ আমার আসল পরিচয় পায়নি। ফলে সুবিধা হয়েছিল প্রচুর।' স্টেটসম্যান পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন- এরপর যখন বাংলাদেশে ফিরে আসি, তখন আমাকে কেউ চিনতে পারেনি। স্বাভাবিক অবস্থায় ছেলে হিসেবে কাজ করা যায় না। দলের কাছে মেয়ে হিসেবে পরিচয় দেওয়ার পর থেকে দলের সবাই আমাকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, "এখন আপনি কি করতে চান?"

মিনারা বেগম

মিনারা বেগম মুক্তিযুদ্ধের আরেক নারী সৈনিক। তিনি পাক সেনাদের টহল ব্যাহত করতে কখনও পানিতে নেমে, আবার কখনও গাছের উপর থেকে গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। তারা আগরতলায় স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেছেন। তারা ভিটগড়ে সীমান্তবর্তী এলাকায় চলে যান। এসময় অধিকাংশ হিন্দুরা ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় জনমানব শূন্য গ্রামে শুধু তারা দুইজন মেয়ে ও একজন পুরুষ অবস্থান করেন। তারা এসময় রাতের বেলা যুদ্ধের কাজ করতেন। চৌদ্দগ্রামের পাশ দিয়ে সিএন্ডবি রোড আগরতলা গেছে, সেখানে সেনাবাহিনী টহল দিত যাতে কোন মুক্তিযোদ্ধা এপারে আসতে না পারে, আবার ওপারে যেতে না পারে। মিনারাদের কাজ ছিল পাক সেনাদের এ টহল নস্যাত করে দেয়া। মিনারা, নিখিল, ফোরকান গভীর রাতে পাক সেনাদের দিকে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতেন। তাদের গাড়ির চাকা নষ্ট করে দিতেন। ফলে তারা আর টহল দিতে পারত না। এমনও অনেক সময় মিনারারা গ্রেনেড ছুঁড়ে পানিতে ডুব দিয়ে অপেক্ষা করতেন। পাকিস্তানিরা চলে চলে গেলে পানি থেকে উঠতেন। পায়ে জোঁক লেগে থাকত। তিনি বলেন- জোঁকের কামড় সহ্য করতে না পেরে হিজল গাছে ওঠেন। তখন মিনারাকে লক্ষ্য করে পাকসেনারা গুলি ছুঁড়ছিল। কিন্তু পাকসেনারা সাধারণ উচ্চতায়

Dhaka University Institutional Repository

গুলি করে। গাছের উপরে গুলি করে না, আবার পানিতে গুলি করে না এজন্য সুবিধা হয়েছিল। পাক সেনারা যখন চলে গেলো তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল। মিনারা বলেন- যখন নেমে এলাম তখন ভোর হয়ে গিয়েছিল, দু'জন লোক আমাকে দেখে ফেলে। আমার পরনে ছিল লুঙ্গি ও মাথায় ছিল গামছা। গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় আমার লম্বা চুল বেরিয়ে পড়ে। ওদের একজন বলল, 'এ যে মাইয়া, এরা মুক্তিবাহিনীর। মাইয়া মানুষ, পুরুষ মানুষ সব কাজ করতাছে একসাথে।'

আশেপাশে যে কয়জন হিন্দু মহিলা ছিল তাদেরকে কলেমা শেখাতাম, নামাজ শেখাতাম, মুসলিম মহিলাদের মতো করে নামাজ পড়ানো শেখাতাম। যাতে বিপদে পড়লে আত্মরক্ষা করতে পারে। আমরা রাতের বেলা পাক সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতাম, দিনের বেলা এসকল কাজ করতাম। পরে তারা ভারতে চলে যান। সেখানে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর পরিচালনা পরিষদের দপ্তর সম্পাদিকা ছিলেন মিনারা। এই বাহিনীর নেতৃত্বে আরো ছিলেন। ফোরকান বেগম, ফরিদা মহিউদ্দীন, জাহানারা হক প্রমুখ।

ডা. লাইলা পারভীন বানু

ডা: লইলা পারভীন (রাজশাহী মেডিকেলের ছাত্রী) মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে কোলকাতায় বাংলাদেশে সরকারের কার্যালয়ে যান। তার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকার পরও তাদেরকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য রাখা হয়। তিনি এটা বুঝেছিলেন যে নারীদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করানোর ব্যাপারে সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেই। তিনি জানান যে, *সেন্টজন্স অ্যাম্বুলেন্সে অ্যাসোসিয়েশন* ক্যাম্পে ভারতীয় প্রতিনিধিরা এসে মেয়েদের ট্রেনিং দিতো। আর আর্মি থেকে এসে একজন মেয়েদের ফিজিক্যাল মুভমেন্ট করাতো। আর ওখান থেকে একজন ডাক্তার আসতেন। তিনি ক্লাস নিতেন, আর আমার কাজ ছিল সেগুলো প্রাকটিক্যালি বুঝিয়ে দেয়া ও দেখিয়ে দেওয়া।

ক্যাম্পের অনেক মেয়েই কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ত। যারা অনেকেই পলিটিক্সের সাথে জড়িত ছিলেন। তাদেরকে শিয়ালদায় বি এবং সিং রেলওয়ে হাসপাতালে ১৬ জন করে ট্রেনিং দেয়া হতো। আমি ওখানে যেতাম। আগরতলা হাসপাতালে থেকে তাকে প্রথম ট্রেনিং প্রাপ্তদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাঠানো হয়। তাঁর কাজ ছিলো থিয়েটার রোড থেকে মেয়েদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ওষুধ নিয়ে আসা। তার ভাষায়, 'আমরা ক্যাম্পেই থাকতাম। মেয়েরা মেঝেতে ঘুমাতো। সঙ্গে থাকত একটা মগ,

Dhaka University Institutional Repository

একটা থালা, দুটো শাড়ি। মেয়েরা নিজেরাই ঠিক করেছিল, যতদিন দেশ স্বাধীন না হবে, ততদিন তারা মাথায় কিছু দেবে না। তারা খালি মাথায় ঘুমাতো।' লেডি ব্রাবোর্ণ থেকে মীরাদি নামের এক প্রফেসর আসতেন, সম্ভবত তিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের প্রধান ছিলেন। মিরাদী তাদেরকে চে গুয়েভারার উপর ক্লাস নিতেন। দুনিয়ার কোথায় যুদ্ধ হচ্ছে, কিভাবে হচ্ছে–এসবের ওপর ধারণা দিতেন।

ডা: লাইলাদের একটাই ভাবনা ছিল দেশকে স্বাধীন করতে হবে, যে ভাবেই হোক।

রাবেয়া খাতুন (রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কর্মী)

মিসেস রাবেয়া খাতুন, সুইপার হিসেবে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকায় কাজ করতেন। তিনি বলেন, "১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে আমি রাজারবাগ পুলিশ ব্যারাকেই ছিলাম।... ক্যান্টিনের কামরা থেকে বন্দুকের নলের মুখে আমাকে ওরা বের করে আনে। আমার ওপর প্রকাশ্যে পাশবিক অত্যাচার করছিল আর কুকুরের মতো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল। পাঞ্জাবি সেনারা, রাজাকার ও দালালদের সাহায্যে রাজধানীর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা ও অভিজাত জনপদ থেকে বহু বাঙালি যুবতী মেয়ে মিলিটারি জিপে, ট্রাকে করে পুলিশ লাইনের বিভিন্ন ব্যারাকে জমায়েত করতে থাকে। .....রাজারবাগ হেডকোয়াটার্স অফিসের ওপর তলায়, সব কক্ষে, বারান্দায় এই নিরীহ মহিলা ও বালিকাদের তাজা রক্ত জমাট হয়েছিল..... ।[২৬]

ফজিলাতুন্নেসা মুজিব

বাংলার স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে ২৫ মার্চ মধ্যরাতে ২৭ নম্বরের বাড়ি থেকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেসা সন্তানসহ বন্দি হন নিজের গৃহে। এ অবস্থায় বড় ছেলে কামালকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠালেন। সে সময় একজন লোক এল ক্যাপ্টেন শফিকউল্লাহ কাছে। সে লোক অগণিত শরণার্থীর মাঝে মিশে যেতে ভয় পাচ্ছেন, কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। পাক-মুক্তি-ভারত আর্মির সবটাকেই তিনি এড়িয়ে চলেন। তিনি এই ক্যাপ্টেনকে কয়েকদিন ধরেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। ক্যাপ্টেন আগন্তুককে জিজ্ঞাস করলেন কেন এসেছেন? তিনি জানালেন, তিনি অতি সংগোপনে কলকাতার প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের কাছে যেতে চান। ক্যাপ্টেন জানালেন, বর্ডার তো খোলা আছে তাহলে যেতে সমস্যা কোথায় ? তিনি বললেন,

Dhaka University Institutional Repository

বর্ডারেও চেক হয়। এখন তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ পেপার আছে। লোকটা অনেক ভাবনা চিন্তার পর একটা একটি হলুদ মলাটে মুখ বন্ধ করা খাম আমার হাতে দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি শেখ মুজিব পত্নী ফজিলাতুন্নেসার চিঠির নিরাপত্তা চান। এ চিঠি তাজউদ্দিনের উদ্দেশ্যে লেখা। শেখ মুজিবের নির্দেশনার বিশেষ কিছু গোপন তথ্যের নিরাপত্তার জন্য তার এতো সতর্কতা।[২৭] লোকটা একজন বাহক মাত্র। ক্যাপ্টেন, লোকটিকে নকশাল ত্রাণসংস্থায় ছদ্মাবরণে কলকাতায় তাজউদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যাপ্টেন জানতেন না পত্রে কি লেখা আছে, আর পত্র খোলাও সমীচিন নয়। পরবর্তীতে তাজউদ্দিন, ওসমানী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা হাকিমপুর ক্যাম্প পরিদর্শনে আসলে তাজউদ্দিন সাহেব সংকেতের মাধ্যমে সেই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করেন। এর স্বল্প কিছুদিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করার দায়িত্ব বিএসএফ এর হাত থেকে ভারতের নিয়মিত সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধ নতুন গতি পায়। ফজিলাতুন্নেসা যে অসাধ্য সাধান করে পত্রটি তাজউদ্দিনের কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন, তা তার দুরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

বেগম খালেদা জিয়া

২৫ মার্চ কালরাতে চট্রগ্রামের ষোল শহর ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কোয়াটার্স গার্ডে সশস্ত্র স্যান্টির কক্ষ। অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে চায় শত্রুরা। পাঞ্জাবি সিও লে. কর্ণেল জানজুয়া নিজে এলেন এদের নিরস্ত্র করতে। হতচকিত হলো বাঙালি সৈনিকরা। ঘটনার আকস্মিকতায় অকুলস্থলে ছুটে এলেন বেগম জিয়া। বাঘিনীর হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, ‘বাংলার সম্পদ ইপি আরের অস্ত্রে আপনাকে হাত দিতে দেবো না কর্নেল জানজুয়া।’ এবার দুঃসাহসের সাথে রুখে দাঁড়ায় ৮ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সদস্যরা। বাংলার স্বাধীনতায় বেগম খালেদা জিয়ার কীর্তি অক্ষয় হয়ে আছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন, তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় তারামন বিবিকে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিল থেকে ২৫ হাজার টাকা দেন এবং সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে আরো ২৫ হাজার টাকা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম হিমাংশু ব্যানার্জি

যশোরের মানুষ স্বাধীনতার জন্য বহু কাজ করেছে। সেসময় যশোর স্বাধীনতার উত্তাল তরঙ্গে কাঁপছে। যশোরের পাশে নিউটাউন এলাকায় আমবাগানে বিদ্রোহী বাঙালী ক্যাম্প, সেখানে যোদ্ধাদের সেবাযত্নের দায়িত্ব নেন নারীরা। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করে খাওয়ান। ২৯ মার্চ নারী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন বেগম হিমাংশু ব্যানার্জি। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে খুলনা মুখে চলমান সশ্রস্ত্র আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে হিমাংশু মৃত্যুবরণ করেন ৩০ মার্চ।[২৮]

আলমতাজ বেগম ছবি

অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা অনেক নারীর গল্প আমরা জানি না। ঝালকাঠির কেওতা গ্রামের হাবিবুর রহমানের কন্যা আলমাতাজ বেগম ছবি। তিন ভাই, ছয় বোনের মধ্যে ছবি পঞ্চম। একাত্তরের মার্চের উত্তাল বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দুইভাই ও ভাইয়ের বন্ধু শাহনেওয়াজ যুদ্ধে যাচ্ছেন। ভাইয়ের বন্ধু নাম সেলিম শাহনেওয়াজের সাথে ছবিদের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। ছবির সাথে শাহনেওয়াজের বিয়ের কথা হয়। কিন্তু বিয়ের আগে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তাই তিনি বড় দুইভাই ও শাহনেওয়াজের সাথে যুদ্ধে যান। মুক্তিযুদ্ধ শিবিরে যোদ্ধাদের রান্নাবান্নার পাশাপাশি অস্ত্র চালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ছবি এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন সতীর্থ পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি।

বহুরাত বিছানা ছেড়ে ঝোড় জঙ্গলে কাটাতে হয়েছে। কত ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে। চারমাস ছিলেন পেয়ারা বাগান, গরংগল, আটঘর, কুড়িয়ানা প্রভৃতি রণাঙ্গনে। ভাত খেতেন কলা পাতায়। যুদ্ধ চলাকালে তরুণী ছবির নিরাপত্তার কথা ভেবে কোন আয়োজন ছাড়াই বিয়ে হয়েছিল। জুলাই মাসে পাকবাহিনী চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ৭/৮ দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় যুদ্ধ করার পর তারা পাকবাহিনীর হামলার মুখে টিকে থাকা সম্ভব নয় জেনে সরে এসে, চলে যান খুলনায়। সেখানে একাধিক যুদ্ধে অংশ নেন তারা।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে এমন কোন অপরামূলক কাজ নেই যা পাক-হানাদার বাহিনী করেনি। হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া সব অপকর্ম করেছে। বাংলাদেশের কোন

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিকের তখন জীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা ছিল না। পাকিস্তানি সেনার গুলিতে প্রাণ হরণ ছিল নিত্য দিনের ঘটনা। নারীদের নিরাপত্তা অভাব শুধু জীবন বা প্রাণহানির জন্য নয়, সম্ভ্রমহানির জন্যও বটে–এই ছিল চলিত ধ্যান-ধারণা। এত কিছুর পর যুদ্ধে নারীরা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন।

আলেয়া বেগম (পুরুষের পোষাকে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ)

চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিট কমাণ্ডার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সিরাজুল ইসলাম তাঁর মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোদ্ধা আলেয়া বেগম সম্পর্কে তথ্য দেন। শত্রুপক্ষ আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। এদেশের দালালদের সাথে বসে নীল নকশা আঁকছে। খুব দ্রুত হানাদার বাহিনী আক্রমণ করবে। এই সংবাদ সবাই শুনতে থাকে। হঠাৎ করে আলেয়া বেগম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন তিনি পুরুষের পোষাকে যুদ্ধক্ষেত্রে শাড়ি ছেড়ে প্যান্ট শার্ট পরে সকলের মানসিক শক্তিকে সমুন্নত রাখতেন। সবাই প্রস্তুত হয়ে সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রাশফায়ারে শত্রুরা শেষ হয়ে গেল। রাইফেল, বন্দুক, এসএমজি, এসএলআর সবকিছু চালাতেই আলেয়া বেগম পারদর্শী ছিলেন। শত্রুপক্ষের শক্তি ও অবস্থান বুঝে তাদের মোকাবিলা করার জন্য এসব সমরাস্ত্র হাতে নিয়ে ছুটতেন। নিমিষে ঝাঁঝরা করে দিতেন পাকহানাদারদের বুক। গুঁড়িয়ে দিতেন শত্রুর ঘাঁটি। একাধিক সম্মুখ সমরে তার ছিল উজ্জ্বল উপস্থিতি।'

সহযোদ্ধা রেজাউল ইসলাম আলেয়া সম্পর্কে বলেন, "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের চাপড় ট্রেনিং ক্যাম্পে আলেয়া বেগম যুদ্ধকৌশল ও সমরাস্ত্র চালানো শেখেন। তখন তিনি ছিলেন সদ্য কিশোরী। বয়স ১৪/১৫ র বেশি হবে না। শরীরে শক্তিমত্তা ছিল অন্যরকম। কোন ভারী কাজে তাকে পিছপা হতে দেখা যায়নি। পুরুষ সহাযোদ্ধাদের পাশাপাশি আগে কদম ফেলে এগিয়েছেন। চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা, দামড়হুদা ও সদর থানা এলাকার যুদ্ধক্ষেত্রে এই কিশোরী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করেছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে। একের পর এক এসাইনমেন্টে তিনি পাকিস্তানি যোদ্ধাদের অবস্থান স্থলে ঢুকে যেতেন। পাকসেনারা শিবিরে ঢুঁ মেরে বের করে আনতেন সব খবর।"

মেহেরুন্নেসা মিরা ও হালিমা খাতুন

মেহেরুন্নেসা ও হালিমা খাতুন ১৯৭১ সালে বাগেরহাট জেলায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মেহেরুন্নেসা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাগেরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে মেজর তাজুল ইসলামের কাছে অস্ত্র চালনা ও ডিনামাইট বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ নেন। তিনি জেলার দশমহল, মাহুতকান্দা,

Dhaka University Institutional Repository

বরইগুনা, খালিশপুর, বেসারগাতী, ভুটাপুর ও সন্তোষপুর এলাকায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। হালিমা খাতুন মুক্তিযোদ্ধের সময় তাঁদের এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রান্না করতেন এবং ভিক্ষুক বেশে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে পৌঁছে দিতেন। বাগেরহাটের একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নেতা মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম চরমভাবে অবহেলিত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বের করার কাজ করেছেন। তিনি এ পর্যন্ত ১৮ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এই দুই মুক্তিযোদ্ধাকে ঢাকায় নিয়ে আসেন।

করুণা বেগম

করুণা বেগম একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য সংগ্রামের দিনগুলোতে বারুদের মতো জ্বলে উঠেছিলেন। বাড়ি বরিশাল জেলায়, দশম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শহীদুল হাসানের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। শহীদুল হাসান চুন্নু, কাজীর চর আওয়ামী লীগের সম্পাদক ছিলেন। শহীদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেন। তিনি দেশের মধ্যে ট্রেনিং নিয়ে শত্রুর সাথে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। হানাদার বাহিনীর সাথে এদেশের একশ্রেণীর পশুরা দেশকে শেষ করে দেয়ার জন্য আঁতাত করেছিল, তারা হচ্ছে রাজাকার। এই জানোয়ার রাজাকার শ্রেণীর লোকেরা শহীদুর ইসলামকে ধরে নিয়ে যায়। মুলাদীর জয়ন্তী নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে নরপশুরা শহিদুল ইসলামকে গুলি করে মেরে ফেলে।

স্বামীর মৃত্যু করুণা বেগমকে মানসিকভাবে চরম আঘাত করেছিল। একমাত্র শিশু পুত্রকে নিয়ে হাবুডুবু খেতে থাকেন। কিন্তু তার এই দুঃখ, কষ্ট, শোক একসময় দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি অস্ত্র ধারণ করেন শত্রুর বিরুদ্ধে, স্বামী হত্যার জন্য প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে যান। তাই স্বামীর মৃত্যুর একমাস পর ৩ বছরের বাচ্চাকে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। গেরিলা বাহিনীতে অংশ নেন।

করুণা বেগম বরিশালের মুলাদী থানায় কুতুব বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। এই বাহিনীতে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। করুনা বেগম এ দলের কমান্ডার ছিলেন। তিনি গ্রেনেড, ষ্টেনগান ও রাইফেল চালানো শেখেন এবং যেকোন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্যের বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। গেরিলা যোদ্ধা করুণার কাজ ছিল ছদ্মবেশে শত্রুর-ছাউনির উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করা। কখনও ভিক্ষারীর বেশে, কখনও গ্রাম্য কুলবধূর বেশে তিনি শত্রুর শিবিরে অপারেশন চালিয়েছেন। এই নির্ভীক মুক্তিসেনা নিবেদিত প্রাণ হয়ে তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। বরিশাল জেলার

Dhaka University Institutional Repository

কসবা, কাশিমাবাদ, বাটাজোর, নন্দীরবাজার ও টরকীতে শত্রুর সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

তাকে একদিন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের দায়িত্ব দেয়া হয়। মহিলারায় শক্ত ঘাঁটি করে পাকিস্তান বাহিনী গ্রামবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছিল। করুণা বেগমরা এই ঘাঁটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। ৫ জন মহিলা ও ১০ জন পুরুষ মিলে একটি দল করে ঐ ঘাঁটি আক্রমণ করেন। তিনি নিজেই পর পর পাঁচটি গ্রেনেড নিক্ষেপের করেন। দিশেহারা হয়ে হানাদার বাহিনী গুলি ছোড়ে। মুক্তিসেনারা স্বল্প সংখ্যক হলেও অসীম সাহসিকতার সাথে চারঘণ্টা ব্যাপীযুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে ১০ হন শত্রুসেনা হতাহত হয়। অপরপক্ষে গেরিলা যোদ্ধাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই আহত হন। তিনি ছিলেন নির্ভীক যোদ্ধা। পাকসেনাদের একটি গুলি তার ডান পায়ে বিদ্ধ হয়। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। সাধারণ গৃহবধুর পরিচয় দিয়ে মুলাদী থানায় হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসা পর্যাপ্ত ছিল না। কাজেই ঠিকমত চিকিৎসা না পাওয়ায় তিনি চলার শক্তি হারান। দেশ স্বাধীন হলো। বরিশাল হাসপাতাল থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে নেয়া হয়। কিন্তু তাঁর পা আর ভাল হয়নি। ক্র্যাচে ভর করে তিনি হাঁটাচলা করেন।

মিরাসি বেগম

কিশোরগঞ্জের ইটনা থানার পায়েরতল গ্রামের অধিবাসী মিরাসি বেগম। তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর চার ছেলেমেয়ে নিয়ে মদন থানায় রান্নার কাজ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকবাহিনী মদন থানার দিকে আসছে খবর পেয়ে থানার পুলিশরা ১২টি রাইফেল মিরাসি বেগমের কাছে রেখে চলে যায়। মিরাসি বেগম রাইফেলগুলো নিয়ে মুক্তিযুদ্ধা কমান্ডারের কাছে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি স্টেনগান চালানো এবং গ্রেনেড ছোঁড়ার প্রশিক্ষণ নেন। তিনি অল্প সময়ে আগ্নেয়াস্ত্র চালানোয় দক্ষ হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে ছিল তার অকুতোভয় মনোভাব। মিরাসি ক্যাম্পের একদিকে রান্নার কাজ করতেন, অন্যদিকে ছদ্মবেশে অস্ত্র-গোলাবারুদ আনা নেওয়ার কাজ করতেন। তিনি মদন,বাজিতপুর, কান্দাহার ও কাপাসটিয়ায় সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। একাত্তরের শেষদিন পর্যন্ত তিনি নিজেকে যুদ্ধের সাথে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। যুদ্ধের সময় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কাঞ্চনমালা

মুন্সিগঞ্জের লৌহজং থানার ডহরি গ্রামের মেয়ে কাঞ্চনমালা। তার বিয়ে হয় নেত্রকোনার দুর্গাপুর থানার বিরিশিরি গ্রামে। বিরিশিরি গ্রামে পাকিস্তানি মেজর জাহিদের হাতে তিনি ধরা পড়েন। পাকবাহিনী তাকে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালায়। একদিন তিনি পালিয়ে যেতে গেলে সিপাহিরা পিছু তাড়া করে এবং তাকে প্রচণ্ড প্রহর করে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন, সিপাহিরা মৃত্যু ভেবে ফেলে রেখে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেন মুক্তিযুদ্ধ ক্যাম্পে শুয়ে আছেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে দেখতে পেয়ে ক্যাম্পে নিয়ে আসেন। তিনি সুস্থ হয়ে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন ভারতের তুরা ক্যাম্পে এবং স্থানীয় টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল ক্যাম্পে। যুদ্ধের বাকি সময় তিনি টাঙ্গাইল ও ঘাটাইলে অবস্থান করেন। তিনি মির্জাপুরের যুদ্ধে অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেন। নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন তুরা হাসপাতাল থেকে। ফলে আহত যোদ্ধাদের শুশ্রুশায় তিনি ছিলেন সর্বদা অপরিহার্য। তিনি মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের শিকার একজন নারী, সশস্ত্র যোদ্ধা, এবং সেবিকা।

কিশোরগঞ্জের সখিনা খাতুন

সত্তর পেরিয়ে যাওয়া সখিনা বিবি সোজা হয়ে হাটতে পারেন না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনলে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি বলেন, ‘জানতাম জিতবই, জিততে না পারলে সবার সাথে আমিও শহীদ হয়ে যেতাম।’ এই মনোবল সত্তরেও তিনি ধারণ করেন। সখিনা একাত্তর সালে যুদ্ধক্ষেত্রে সংবাদ দাতার ভূমিকা পালন করেছেন। ভিখারীর বেশে ঘুরে বেড়াতেন। রেকি করতেন শত্রু পাকিস্তানী সৈন্য, রাজাকার, আল বদর বাহিনীর অবস্থান মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দিতেন সঠিক তথ্য ও সংবাদ। সেই মোতবেক যুদ্ধ ও পাল্টা আক্রমণ হতো। কখনও ভিখারিণী, কখনও পাগলিনীর বেশে ঘুরে বেড়াতেন। পাকবাহিনী তাকে ভিখারিনী আর পাগলিনী হিসেবে জানত। এ নিয়ে তারা ঠাট্টা মশকরা করত। কয়েকবার সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করেছে কিন্তু কেঁদে কেটে এমন অবস্থা তৈরি করতেন। তখন তাকে আবার ছেড়ে দিত। তিনি অন্ধকার রাতে ক্রলিং করেছেন। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়েছেন। এসব কিছু শিখেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে থেকে। খাওয়া-দাওয়া চলত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে তিনি স্মরনীয় হয়ে আছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সানজীদা খাতুন (শিল্পী ও শিক্ষাবিদ)

দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীরা যে যেভাবে পেরেছেন, সে তার জায়গা থেকে সেভাবে কাজ করেছেন। সানজীদা খাতুন ও তেমনি একজন দেশ প্রেমিক যোদ্ধা। দেশের সংকটকালীন শিল্পীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। এসব সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলে। তারা পাকহানাদের নির্যাতনের কাহিনী প্রচার করে। এই প্রতিবাদী ধারায় সানজিদা বেছে নেন জাতীয় সংগীত। কারণ সুর মানুষের হৃদয়কে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয়। ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৭১ সালে সানজিদা খাতুন দেশের জন্য নির্মোহভাবে কাজ করেছেন। "মানুষ হ, মানুষ হ, আবার তোরা মানুষ হ, বাংলা মা দুর্নিবার আমরা তরুণ দল, খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি ও আমার দেশের মাটি, সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে-"এ জাতীয় গান গেয়ে মানুষের মাঝে শক্তি জাগিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কিছু সংখ্যক শিল্পী ভারতে পালিয়ে যান। গঠিত হয় মুক্তিযুদ্ধ শিল্পী সংস্থা। এর সেক্রেটারি ছিলেন মাহমুদুর রহমান বেনু ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন সানজীদা খাতুন।

তিনি নিরপেক্ষ দিল্লিতে একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নানা দেশ ও জাতির জনগণের কাছে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাজ্ঞের কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে শরণার্থী শিবিরে এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করতেন। এই সময় অনেকে আবেগ তাড়িত হয়ে তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতো এবং 'জয়বাংলা' বলে জয়ধ্বনি দিত।[২৯] অতএব দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতি কর্মীদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

মালেকা বেগম

বাংলাদেশে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে করা একজন চৌকস নারী মালেকা বেগম। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। ১৯৬৮-৬৯ সালের উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে আগরতলা মামলায় বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ, অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বন্দি নেতা-কর্মীদের আত্মীয়-স্বজন ও রাজনৈতিক কর্মীদের মাঝ থেকে তিনি নারীদেরকে সংগঠিত করেন। তাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মেয়েদের স্বাক্ষর সংগ্রহ, লিফলেট বিতরণ, বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেন। এছাড়া যেসব নারীরা রাজনীতি সচেতন ছিলেন না তাদেরকেও তিনি সংগঠিত করেন। ১৯৬৯ সালে কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মালেকা বেগম ছিলেন এ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদের উদ্যোগে সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন করা, রাজবন্দিদের মুক্তি, মহিলা শ্রমিকের সমমজুরি, পর্যাপ্ত সংখ্যক মাতৃসদন, শিশু হাসপাতাল স্থাপন করা, যৌতুক ও নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিসহ নারীদের অধিকার সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেন। ১৯৭১ সালে আগরতলায় অবস্থান করে বাংলাদেশের নারীদের উপর চালানো ধর্ষনসহ অন্যান্য অত্যাচারের তথ্য সংগ্রহ করে মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে বুকলেট বের করা হয়।

ভারতীয় নারী ফেডারেশনের আমন্ত্রণে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরির সাথে তিনি নারী নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় মেয়েদের সমর্থন আদায় করার জন্য কলকাতা, জলপাইগুড়ি, পানিপথ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও দিল্লিতে যান। এছাড়া তিনি বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে শরণার্থীদের দেখভালও করেছেন।

রাফিয়া আখতার ডলি

তিনি ১৯৬২ সালে শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সাতটি মহিলা আসনের একটিতে রাফিয়া আকতার ডলি জয়ী হন। তিনি এম. এল. এ হলেন। একাত্তরের ৩ মার্চ সংসদ বসার কথা ছিল। কিন্তু ১ মার্চ সংসদ বসবে না বলে নির্দেশনা দেয়া হয়। সরকারের এই নির্দেশ আসা মাত্রই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা থেকে হোটেল পূর্বাণীর দিকে রওনা হন। সেখানে আওয়ামী লীগের সভা চলছিল। তারা সেখানে উপস্থিত হলে ছাত্রজনতা দাবি করেছিল, ৭ মার্চ যেন স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়।

২৫ মার্চ রাতের আক্রমণ সম্পর্কে তিনি বলেন- সেসময় সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্ব মেয়েদের প্রশিক্ষণ চলছিল। ২৫ মার্চ তারা আগারগাঁওয়ের একটি স্কুলে মেয়েদের নিয়ে ট্রেনিং চলছিল, এমন সময় খবর পাই পার্কমোটরে (বর্তমান বাংলামোটর) ব্যারিকেড দিতে যেতে একজন ছাত্র আর্মির গুলিতে মারা গেছে। এ সংবাদ শুনে সেখানে আসি। রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া হয়েছে। পুলিশ আসতে দিচ্ছে না। তখন সাজেদা চৌধুরীর বাসায় থেকে গেলাম। ঐ রাতেই আক্রমণ শুরু হয়। পাকিস্তানী বাহিনী বিভিন্ন হল এট্যাক করেছে। সেখান থেকে বের হলাম, দেখলাম বস্তির পর বস্তির পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেখান থেকে সোজা টাঙ্গাইল চলে যাই। তারপর ২৫ মাইল হেটে তুয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে চলে

Dhaka University Institutional Repository

যান। সেখানে মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে ঝিকরাগাছায় যুদ্ধে যোগ দেই। এরপর নয়মাস যুদ্ধ চলে। ১৪ ডিসেম্বরে যশোরের ঝিকরাগাছায় প্রথম মুক্তাঞ্চলে মিটিং করতে যাই।

আশয়া খানম

মুক্তিযুদ্ধের আগে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের ভি.পি ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী। মার্চের আন্দোলনের সময় ছাত্রীরা যখন হল ত্যাগ করল, তখন থেকেই তিনি ছাত্রীনেত্রী রাকার বাসায় ছিলেন। এপ্রিলে মতিউর রহমানের নানাবাড়ি কাপাসিয়া চলে যান। পরে সীমান্ত দিয়ে আগরতলা ক্রাফটস হোস্টেলে ওঠেন। এ হোস্টেলটি ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ট্রেনিং ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহৃত হত। তিনি সাধারণত মোটিভেশনল কাজের দায়িত্ব পালন করতেন। সে সময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতারে ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন। ট্রানজিট ক্যাম্পেও তিনি কাজ করেছেন। পরবর্তী সময়ে নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে গান্ধী বল্লভে কাজ করেছেন।

সাঈদা কামাল

মুক্তিযুদ্ধকালীন সুলতানা কামাল ও সাঈদা কামাল নার্স হিসেবে কাজ করেছেন। এরা কবি সুফিয়া কামালের দুই মেয়ে। তারা দুই নং সেক্টরের অধীনে কাজ করেছেন। সাঈদা কামালের ভাষায় সে সময় তিনি চারুকলার ছাত্রী। ঢাকায় একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। বাসায় বন্দি হয়ে আছেন, কি করবেন ভাবলেন। এমন সময় শাহদাত চৌধুরী ও ফয়েদ আলী জানালেন, আগরতলায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাসপাতাল বানানো হয়েছে। কিছু নার্স লাগবে। ১৫ জুন ঢাকা থেকে আগরতলায় একটা দল যাবে। এ খবর শুনে তারা সেখানে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেন। গায়ে বোরকা চাপিয়ে কুমিল্লা দিয়ে সোনামুড়ে পৌঁছালেন। গ্রামটি আগরতলা থেকে ৩৫ কি.মি. দূরে। সেখানে ক্যাপ্টেন আখতারের সাথে দেখা ঐ হাসাপাতলে যান। ইতোপূর্বে তাদের নার্সিং বিষয়ে কোন ধারণা ছিল না। আখতার তার বাগান তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। হাসপাতালটি বাঁশের টানা ব্যারা (বাউন্ডারি) দিয়ে তৈরি হাসপাতালটি ছিল ৪০ বেডের। সব মিলে মেয়েরা ছিল ১০ জন। এভাবে তারা দেশের জন্য কাজ করেছেন। নভেম্বরের শেষের দিকে তারা কলকাতায় চলে যান।

Dhaka University Institutional Repository

নায়লা খান (ডাক্তার)

১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের সকাল বেলায় সেক্টর কমাণ্ডার নুরুজ্জামান তার তিন সন্তানকে ডেকে বললেন- এতদিন সংগ্রাম ছিল মিছিল ও স্লোগানের। আজ থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হবে। আমি যুদ্ধে চলে যাচ্ছি। তোমরা যেভাবে পারো যুদ্ধে যাও।

তখন সন্তান নায়লা খান অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতে চলে যান। এটা জুনের প্রথম দিকের ঘটনা। জুনের মাঝামাঝি সময়ে একটা গানের দল তৈরি হয়। সেই গানের দলটা বিভিন্ন শরণার্থীদের ক্যাম্পে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিল। নায়লারা দুই বোন ওই গানের দলে যোগ দিলেন। তাদের সাথে ছিল রেহানা উদ্দিনা, শাহানা, জরিনাসহ অনেকে। এসময় তার বোনের সাথে মিলে গড়ে তোলেন বাচ্চাদের জন্য অরফানেজ। তাদের অবস্থাটা এমন ছিল যে- তারা মুক্তি বাহিনীর জন্য যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। নায়লা এসম্পর্কে বলেন- আখতার ভাই আমাদের ট্রেনিং দিলেন। সেখান থেকে খানিকদূরে ছোটখাটো ঘরে ১০-১২ চাটাই বিছিয়ে হাসপাতাল বানানো হলো। কেউ গুলি খাওয়া, কারোর হাত নেই, কারোর পা নেই। এই হাসপাতালটি ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে। সেখানে খালেদ মোশারফ আসতেন। এই গ্রামটা বর্ডারের কাছাকাছি হওয়ার সমস্যা হতো। পরে হাসপাতাল সেখান থেকে অন্য আরেক জায়গায় সরিয়ে নেয় হয়।

হাসপাতালে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কম থাকত কিন্তু দিনে দিনে রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ফলে কেউ ইনজুরি হলে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হতো। এজন্য আরেকটা হাসপাতাল তৈরির প্রযোজন দেখা দেয়। তাই বাংলাদেশ সরকারে সাথে যোগাযোগ করা হয়। পরে নায়লা খান ৭নং সেক্টরে চলে আসেন। ওখানকার মসজিদ আমরাবাগানে গিয়ে কাজ শুরু করেন। সেখানে ছিলেন- ডা. মোস্তফা, ডা. মোয়াজ্জেম আর তারা দুই বোন। তখন তারা শুরু করলেন অ্যাডভান্স ড্রেসিং স্টেশন। তারা যুদ্ধে ছোট বড় তিন ট্যাঙ্ক নিয়ে চলে যেতেন।

মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন, রক্তের বন্যায় ভেসে যেতো সব। যে যার জায়গা থেকে যুদ্ধ করেছে। কেউ গান গেয়ে, কেউ অস্ত্র হাতে নিয়ে, কেউ যুদ্ধাহত মানুষকে সেবা করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে নারী

মুক্তিযুদ্ধকে গতিশীলী ও সফল করতে সবচেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছেন গেরিলা নারীরা। বাংলার প্রতিটি গ্রাম-গঞ্জ, হাট-বাজার, শহর-বন্দর সকল জায়গায় নারীরা মুক্তিযোদ্ধার সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন কিছু নারী ছিলেন যাদের কোন অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট গোলাবারুদ পৌঁছে দিয়েছেন, বাংকারে খাবার পৌঁছে দিয়েছেন, অস্ত্র পরিষ্কারসহ বিভিন্ন কাজ করেছেন। ত্রিপুরার কাঁকন বিবি, পাবনার ভানুনেছা, গোপালগঞ্জের আমেনা বেগম এ জাতীয় কাজ করেছেন।[৩০] তাদের এসকল সক্রিয় কর্মকাণ্ড না থাকলে এতদ্রুত হয়তো দেশ স্বাধীন হতো না। তারা বোমা বহন, গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ, সংবাদ আদান-প্রদান, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, অর্থ সংগ্রহ ও সরবরাহ, ঔষধ সরবরাহ, খাদ্য ও শীতবস্ত্র সংগ্রহ, চিকিৎসা সেবা ও আশ্রয় দানসহ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজে তারা বেশ সক্রিয় ছিলেন।

ঢাকায় গেরিলা যোদ্ধা বোনদের কথা প্রসঙ্গে হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ বলেন-ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলে এক অ্যাকশনের প্রয়োজনে স্কুলের ভিতর অস্ত্র বহন করার দায়িত্ব পালন করেন এক ছাত্রের মা। রাজাকার আর্মিদের পাহারা এড়িয়ে বোরখার নিচে অস্ত্র বহন করে স্কুলের ভিতর গেরিলা যোদ্ধাদের পৌঁছে দেন একজন মা। .....মগবাজারে ওয়ারলেস এলাকায় চার গেরিলা ভাইদের একবোন সুরাইয়া আক্তার বেবী গোলাবারুদ হাতে পাক আর্মিরা সাথে লড়াইয়ে গেরিলা অ্যাকশনে যোগ দেন।[৩১]

১৯৭১ সালে কসবা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে মুক্তিবাহিনীর কাছে পরিচিত ছিল। এ স্থানের একজন নারী মুক্তিযোদ্ধা মমতাজ বেগমের ভূমিকা সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধা এম.এস এ মনজুর আহমেদ বলেছেন, "মমতাজ আপা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টনদের সাথে যোগ দিয়ে পাক আর্মিদের মুখোমুখি হয়ে সালদা নদী খাদ্যগুদাম ভেঙ্গে খাবার নিয়ে আসেন। মমতাজ আপা আগরতলা থেকে ডিসি সাবেহকে বলে গাড়ি ম্যানেজ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাঙ্কারে পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে। উনি অনেক সহযোগিতা করেছেন। উনি তখন ইউনিভার্সিটি থেকে সদ্য বের হওয়া একজন মহিলা।"[৩২] আহত বা অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিংয়ের দায়িত্ব মূলত নারীরাই পালন করতেন। সীমান্ত বা মুক্তাঞ্চলে অস্থায়ী হাসপাতালে নারীরাই সেবা করতেন। তারা নার্সিংয়ের ট্রেনিং ছাড়াই রোগীর সেবা করতে এসে দেশপ্রেমের বিরল নিদর্শন রেখেছেন। সেসময় মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নরত

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্রীরাই বিভিন্ন হাসপাতালে সেবা দিয়েছেন। মুজিবনগর সরকার নার্সিং প্রশিক্ষণের জন্য একটি বোর্ড গঠন করেছিলেন। এই বোর্ড পরিচালনার দায়িত্ব ছিলেন বদরুন্নেসা আহমেদ, রাফিয়া আক্তার ডলি, সাজেদা চৌধুরি ও মমতাজ বেগম।

তখন নারীর অন্যতম ভূমিকা ছিল অনুপ্রেরণাদানকারী হিসেবে। মা, স্ত্রী, বোনেরা যুদ্ধের সময় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তার তুলনা হয়না। তারা স্বেচ্ছায় আপনজনদেরকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। জাহানারা ইমাম তার অন্যতম উদাহরণ। সন্তান রুমীকে তিনি দেশের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। তেমনি হাজারো মা বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, যারা তাদের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। অনেকে আবার স্বামীকে পাঠিয়েছেন, কেউ পাঠিয়েছেন ভাইদেরদেরকে। তাদের মূল লক্ষ ছিল একটাই বাংলাদেশ যেন স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। পাক বাহিনী যেন দ্রুতই পরাজিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র, গ্রন্থসমূহ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ বর্ণনায় পাওয়া যায় যে- ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, খুলনা, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন শহর-বন্দর, গ্রামে-গঞ্জে গেরিলারা যুদ্ধ করেছেন, আত্মগোপন করেছেন। আর এসব জায়গায় নারীরা তাদের সর্বাত্মকভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। নারীর সাহায্য ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। এ প্রসঙ্গে মুক্তিযোদ্ধা হারুন হাবিব লিখেছেন- মুক্তিযোদ্ধা রবিউল যখন আহত হন, তখন গ্রামের গৃহবঁধুরা সহায়তা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্ততবোধ করেছিলেন।[৩৩] নারীরা তখন যোদ্ধা এবং পুরুষের সহযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা গেরিলাযোদ্ধা হিসেবে সারা বাংলার মানুষের পাশে ছিলেন। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের সর্বক্ষেত্রে তাদের ব্যাপক উপস্থিতির মাধ্যমে তারা যুদ্ধকে আরো বেগবান করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক বিভিন্ন সাংগঠনিক তৎপরতা এবং তাতে নারীর অংশগ্রহণ

মুক্তিযুদ্ধকে নারীরা সফল করতে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তারা যুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে সর্বদাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণ তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলেছিল। তারা দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনও করেছেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করার স্বপ্নে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সংগঠনের নেতা-কর্মীগণ

Dhaka University Institutional Repository

সংগঠিত হতে থাকেন। এই সব দলের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের সাথে যুক্ত করা এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য লোকজন সংগ্রহ করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে মহিলা ও ছাত্রী কর্মীদের এক বিশাল দলকে ভারতে সংগঠিত করা হয়। রোকেয়া কবির মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন। বদরুন্নেসা আহমেদকে (১৯২৪-১৯৭৪) মুজিবনগর মহিলা পুনবার্সন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ও মহিলা সংগঠনের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে রিপোর্ট দেওয়া, শরণার্থীদের চিকিৎসা দেয়া, ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা ও শরণার্থী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা তাঁর অন্যতম কাজ ছিল। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ১৯৭১ সালে নুরজাহান মুরশিদকে ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলে তিনি ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণার কাজে অংশ নেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতির জন্য সমর্থন আদায়ের প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। ওই সময় ভারতের পার্লামেন্টের যুক্ত অধিবেশনে তিনি বাংলাদেশের সমর্থন আদায়ের ব্যাপারে বক্তব্য দিলে পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেন এবং তাঁর বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। উল্লেখ্য, তিনিই একমাত্র মহিলা, যার বিরুদ্ধে ইয়াহিয়া খান এই দণ্ডাদেশ জারি করেন।[৩৪]

মুজিব নগর সরকারের দায়িত্বে নিয়োজিত সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের কথা চিন্তা-ভাবনা করে নারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি মুজিব নগর সরকার ও ভারত সরকারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় জুন মাসের প্রথম দিকে কলকাতার পদ্মপুকুর এলাকায় গোবরা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। সেখানে নারীদের খাওয়া-দাওয়া, যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হত। এসময় মমতাজ বেগম মুজিব বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় দাপ্তরিক ও কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রিভালভার চালানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নানা সামরিক কৌশল রপ্ত করেন। তাছাড়াও মুক্তিযুদ্ধকালীন নারীরা 'জেলা সাব-সেক্টর মহিলা মুক্তিফৌজ সহায়ক কমিটি' গঠনের মাধ্যমে নিজেদের সক্রিয় অবস্থান তৈরি করেন। হেমেন্দ্র দাশপুরকায়স্থ মহিলা মুক্তিফৌজের হাল ধরেছিলেন। সভানেত্রী প্রীতি রানী, সহ-সভাপতি গীতা রানী নাথ, সম্পাদিকা নিবেদিতা দাসসহ অনেক নারীকে নিয়ে এর কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। তাদের কাজ ছিল ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ হয়ে সুষ্ঠভাবে দায়িত্ব পালন করা। এছাড়াও তাদের অন্যতম কাজ ছিল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রাখা। মহিলা মুক্তিফৌজের প্রথম সাংগঠনিক সভায় 'আমাদের কর্তব্য' শিরোনামে ছয়টি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কণিকা বিশ্বাস তার সাক্ষাৎকারে বলেন- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তিনি গোপালগঞ্জ মহকুমার কাশিয়ানি থানার ওড়াকান্দি গ্রামে ছিলেন। সেখানে থাকতেই তিনি পাকিস্তানি সেনাদের সশস্ত্র আক্রমণের খবর পেয়েছেন এবং সেই পরিস্থিতি অনুযায়ী জুলাই মাস পর্যন্ত গোপালগঞ্জ মহাকুমার নানা অঞ্চলে অবস্থান করে আওয়ামী লীগের কর্মী ও যুবকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন।[৩৫] আইভি রহমানও শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ক্যাম্পগুলাতে সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন।[৩৬] সরকারি পর্যায়ে, বেসরকারিভাবে বা নিজ উদ্যোগে মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সাথে একাত্ম হন। বিশেষ করে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি স্বল্প সংখ্যক হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় তারা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের গান শুনিয়ে উজ্জীবিত করতেন। মেজর জলিল একটি নারী ইউনিট গঠন করেছিলেন।[৩৭] যারা ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা-পর্বে সরাসরি সংগঠকের কাজ করেছেন, তাদের অনেকের মধ্যে ছিলেন সালমা ইসলাম ও সুলতানা জামান। ড. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা তার গ্রন্থে তাদের সাংগঠনিক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

ঢাকায় থেকে সংস্কৃতিমনা যেসব ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তারা দুটি ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। (১) ভারতের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ প্রচারের জন্য একটি গানের স্কোয়াড তৈরি করা এবং (২) বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে-ঘুরে দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শরণার্থীদের উজ্জীবিত করা।[৩৯] মুক্তিযুদ্ধের সময় গোপনে লিফলেট ও পত্রিকা ছাপানো এবং সেগুলো এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানো বেশ কঠিন ছিল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সাইক্লোস্টাইল মেশিনে ছাপার কাজ করা হত। এই এলাকা ছাড়াও নটরডেম কলেজ, কলা বাগান এলাকায় লিফলেট ও পত্রিকা ছাপার কাজ করা হতো এবং বিলি করার কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সাহায্য করতেন।

যুদ্ধ চলাকালে যোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখতে এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিশেষত বিভিন্ন দেশাত্মবোধক গানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময়ের অন্যতম গান ছিল- শাহনাজ বেগমের কণ্ঠে- 'সোনা, সোনা, সোনা লোকে বলে সোনা' কল্যাণী ঘোষের- 'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'- এ জাতীয় গানে মানুষ শিহরিত হয়েছে, দেশের টানে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এছাড়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করে ইংরেজি খবর পড়া হতো। পারভীন হোসেন, নাসরিন আহমেদ শিলু প্রমুখ সংবাদ পাঠের কাজ করতেন। দেশের ভেতরে

Dhaka University Institutional Repository

থাকা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিরাপত্তার কারণে তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। এসব গানের শিল্পী সময়ের প্রয়োজনে তখন খবর পাঠিকাও হন। এই কাজে আরো যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন- কল্যাণী ঘোষ, উমা স্বপ্নারায়, বুলবুল মহলানবীশ, অমিতা বসু, ফ্লোরা আহমেদ, ফেরদৌসী মজুমদার, ঝুমু খান প্রমুখ।[৪০] জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে, বিজয়ের আশা জাগাতে, দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে, শিল্পী সমাজ মানুষকে দারুনভাবে উদ্বেলিত করেছিল। দেশাত্মবোধক গান, নাটকসহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীরা তখন অংশগ্রহণ করেছেন ।

নারী শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করা, ডাইরী লেখা, সাহিত্য রচনা করা, গান পরিবেশন করা ইত্যাদি বিষয়ে সংগঠক ও সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের লেখনীতে উঠে এসেছে তৎকালীন বিভিন্ন অবস্থার বাস্তব চিত্র। এসব কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে- সুফিয়া কামাল, রমা চৌধুরী, নিলীমা ইব্রাহিম, জাহানারা ইমাম, রিজিয়া রহমান, মকবুলা মঞ্জুর, সেলিনা হোসেন, পান্না কায়সার, মেঘনা গুহঠাকুরতা, বেগম মুশতারী শফী, খালেদা সালাহদ্দীন, উম্মে হাবিবা, হেনা দাশ, ফরিদা আক্তার, সুলতানা কামাল, আখতার ইমাম, আয়েশা বানু প্রমুখ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

৩ এপ্রিল (১৯৭১) প্রবাসী বাঙ্গালী নারীরা প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে লন্ডনের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। অবশেষে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সংগঠিত হয়ে প্রচার-প্রচারণা চালান। বিভিন্ন দেশের দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন করার আবেদন সংবলিত স্মারকলিপিও পেশ করেন।[৪১] ১ মে (১৯৭১) উলস্টার শহরে পাকিস্তানি ক্রিকেট টিমের প্রথম ম্যাচের বিরুদ্ধে প্রবাসী বাঙ্গালী নারী-পুরুষেরা বিক্ষোভ করেন। স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির নেত্রী প্রবাসী সুরাইয়া খানমও বাংলাদেশীদের প্রচার আন্দোলনকে সমর্থন করেন। বাংলাদেশ গণসংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা মুন্নি রহমানও সংগঠক হিসেবে দৃঢ় ভূমিকা রাখেন।[৪২] বাংলাদেশের সংগ্রামী নেত্রী আশলেতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) এসময় তিনি নিউইয়ার্কে বিশ্বব্যাংকে কর্মরত তার ছেলে সমর সেনের বাসায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসীদের সংগঠিত করেন। তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের ভবনের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে ভাষণ দেন, অনাশনকারীদের সাথে যোগ দিয়ে অনশনও করেন।[৪৩]

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী ও প্রত্যক্ষদর্শী নারীর বিবরণ রয়েছে গবেষক সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত বাংলাদেশে *মুক্তিযুদ্ধ* ১৯৭১ নামক বইতে।[৪৪] এই গ্রন্থে *সম্পাদকের কথায়* তিনি লেখেন-'বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে নারীর ভূমিকাকে আলাদা করে দেখার প্রয়াস শুরু হয় বিগত নব্বইয়ের দশক থেকে। এর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনায় নারীর ভূমিকা ছিল অনুপস্থিত। 'মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র' থেকে প্রথমবারের মতো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট ১১৩ জন নারীর অভিজ্ঞতার বিবরণ তিন খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এ সকল নারীরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী, পেশা, পরিবার থেকে এসেছেন। এর মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব, শহর-গ্রামের নারীরাও আছেন। তাদের সাথে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। ৩ খণ্ডের বইতে খুলনার ৯ জন, ঢাকার ১৯ জন, বরিশালের ২৮ জন, দিনাজপুরের ১৫ জন, নারায়ণগঞ্জের ৭ জন, রাজশাহীর ২ জন, নাটোরের ১২ জন, সিলেটের ৯ জন, মেহেরপুরের ৩ জন, কুমিল্লার ১ জন, কসবার ৭ জন, সিরাজগঞ্জের ১ জন নারীর মৌখিক বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। এরা কেউ পাশবিক অত্যাচারের স্বীকার হয়েছেন, কেউ অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন, কেউ বা ছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে গবেষক আফসান চৌধুরী *বাংলাদেশ* ১৯৭১ বইয়ের ভূমিকায় বলেন, নারী অধ্যায়টি আমাদের কাছে গ্রন্থের মূল অধ্যায় বা এমন একটি অধ্যায় মনে হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের সকল মাত্রিকতা যোগ হয়েছে। নারীদের মূল ভূমিকা হচ্ছে সহযোদ্ধা, বার্তাবাহক, সেবিকা হিসেবে। এই সকল ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নারীরা পালন করেছে তারপরও আমাদের সবার কাছে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, সমাজের ও পরিবারে ধাত্রী হিসেবে তার একটি উপেক্ষিত ইতিহাস। আমরা সেই দিকটাই নজর দিয়েছি কারণ যে নারী বা নারীগোষ্ঠী সমাজ আগলে রাখে সেই প্রকৃত ধাত্রী। ১৯৭১ সালে নারী বহু ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হয়, বিশেষ করে যেখানে পুরুষরা অনুপস্থিত ছিল। যে ভূমিকা পালন করার জন্যই হোক তবে উদ্দেশ্য ছিল টিকে থাকা, সমাজ ও সংসারকে সামলানো এবং মানবিকতাকে লালন করা। সেই কারণেই নারীকে মনে হয়েছে ১৯৭১ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ত্রাণকর্তা। তাঁর মধ্যে সকল মাত্রিকতার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে।

এছাড়াও আফসান চৌধুরী *আদিবাসী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ* গ্রন্থে দুই আদিবাসী নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা হলেন সালগী খাড়িয়া ও প্রিনছা খেঁ। নিম্নে তার সে বর্ণনার সারবস্তু উল্লেখ করা হলো: নারী মুক্তিযোদ্ধা সালগীর খাড়িয়ার কথা। সিন্দুরখান চা-বাগানের

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকবন্ধু খাড়িয়ার বিধবা মেয়ে সলিগী খাড়িয়াকে শ্রীমঙ্গলের কমলগঞ্জ এলাকায় পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা শেরখান বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করে। সালগী খাড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেরখানের স্ত্রী হয়ে থাকতে বাধ্য হন। কিন্তু সালগীর খাড়িয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গাপনে যোগাযোগ রাখেন। চা-বাগানের বহু চেনা-অচেনা বন্দি ব্যক্তিকে তিনি স্বামী শেরখানের হাত থেকে কৌশল করে বাঁচান। তার স্বামীর কবল থেকে বেঁচে যাওয়া একজন ব্যক্তি উত্তম কুমার, তিনি সালগী খাড়িয়ার অবদানকে মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকা বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সালগীর দেওয়া খবর অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা শেরখানকে হত্যা করতে সমর্থ হন।

আদিবাসী রাখাইন মেয়ে প্রিণছা খেঁ ১৯৭০ সালে জলোচ্ছ্বাসে মা-বাবাকে হারান। সে সময় তিনি টেকনাফে দুর্গত মানুষদের সেবা করতে আসা সহায়তাকারী চিকিৎসা দলের সঙ্গে নার্স হিসেবে আর্তদের সেবা করার সুযোগ পান। সেই দলের সাথে তিনি কুয়াকাটায় যান। সেখানে তিনি সুরেন বাবুর (১৯৩০ সালে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের একজন সদস্য) আশ্রয়ে ছিলেন। পাকিস্তানিরা সুরেন বাবুকে হত্যা করে, প্রিণছাকে বাউকাঠি গ্রামের পাকিস্তান বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যায়। প্রিনছা খেঁ পাকবাহিনী সেনাদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। তিনি সেনাদের কাছ থেকে অস্ত্র চালনা করা ও পরিষ্কার করা শেখেন। সেনাক্যাম্পে কাঠ পাঠানো জোগানদগার বাবুলের সাথে গোপনে পাক সেনাদের হত্যার পরিকল্পনা করেন। এরপর কৌশলে তিনি বিষ সংগ্রহ করেন। পাকিস্তানি সেনাদের খাবারের সাথে সেই বিষ মিশিয়ে ৪২ জনকে অচেতন করেন এবং তাদের মধ্যে ১৪ জন মারা যায়। এরপর তিনি সেখানে থেকে চলে আসেন।

মুক্তিযুদ্ধে সকল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, উপজাতিসহ সকল সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ বাংলা থেকে পাকিস্তানিদের মুক্ত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে *বাঙ্গালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়* গ্রন্থে প্রণবকুমার বড়ুয়া এরকম কয়েকজন বৌদ্ধ নারীর কথা তুলে ধরেছেন। এসকল বৌদ্ধ মহিলা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। তারা হচ্ছেন- ননীবালা বড়ুয়া, প্রতিভা মৎসুদ্দী, করুণা বড়ুয়া, ডা. রেণুকণা বড়ুয়া, সুনীতি বড়ুয়া, অজিতা বড়ুয়া।[৪৫] অথচ তাদের এ ইতিাস মানুষ খুব কমই জানে। আইনজীবী সাহারা খাতুন আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে দেশের ভেতরে থেকে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার রওশন আরা বেগম তার ছয়মাসের শিশুপুত্রকে মায়ের কাছে রেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য চলে যান ভারতের ক্যাম্পে। ভারতের গিয়ে গোবরা ক্যাম্পে তার সাথে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন লীনা চক্রবর্তী, যূথিকা চ্যাটার্জি, জিন্নাতুন্নেছা তালুকদার, কৃষ্ণা রহমান প্রমুখ।[৪৬] নারীদের উপর নির্যাতন, প্রতিকূল পরিবেশ এবং সর্বোপরি দেশেকে স্বাধীন করার তাগিদে নারীরা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে টাঙ্গাইলের খাদিজা সিদ্দিকের থেকে জানা যায়, "মুক্তিযুদ্ধ যখন আসন্ন প্রায়, তখন রাফিয়া আক্তার ডলি, নাজমি আরা রুবি, নিবেদিতা মণ্ডল, খাদিজা সিদ্দিকী প্রমুখ আত্মরক্ষা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।"[৪৭]

যোদ্ধা ও সংগঠক মুশতারী শফী, তাঁর *স্বাধীনতা আমার রক্তঝরা দিন* গ্রন্থে বলেন, " চট্টগ্রাম ২৯ মার্চ পর্যন্ত ছিল এখানকার বীর জনতার দুর্বার প্রতিরোধে মুক্ত। ..... অনেকে চলে গেল ভারতে। গঠিত হলো মুক্তিবাহিনী। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ। তবে দেশজুড়ে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে যে যেখানেই যাক না কেন, প্রীতিলতার উত্তরাসূরি চট্টগ্রামের নারী শুধু প্রাণভয়ে নিষ্ক্রিয় বসে থাকেনি কোথাও। কেউ স্বাধীন বাংলা বেতারে শিল্পী ও শব্দ সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছে। ..... দেশের ভেতরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য দিয়ে, শীতবস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়ে, পাকবাহিনীর অবস্থানের খবরাখবর সংগ্রহ করে মুক্তিবাহিনীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ইত্যাদি নানা রকম দুঃসাহসিক কাজের স্বাক্ষর রেখে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছেন গুরুত্বপূর্ণ, ঐতিহ্যময়। আর এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে গিয়ে কত নারী হয়েছেন নিঃস্ব, সর্বহারা। ..... আমি এ গ্রন্থে ক'জনের কথাই বা তুলে ধরতে পারলাম।"[৪৮]

মুক্তিযোদ্ধা ডা. এম.এস. এ মনসুর আহমেদ বলেন, "আমার মুক্তিযুদ্ধের লাইফ শুরু হলো জুনের শেষের দিকে। .....বিশ্রামগঞ্জে গেলাম অক্টোবর মাসে। .....সেখানে দেখলাম ক্যাপ্টেন সিতারা, সে মেজর হায়দার সাহেবের বোন। She was a doctor there.....আর ওখানে নার্সিং সার্ভিস দিত। ঢাকা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন মেয়ে সুলতানা কামাল, সাঈদা কামাল, শিমুল বিল্লাহ, তারপর পদ্মা রহমান, জাকিয়া আপা, (উনি ইডেন কলেজের শিক্ষিকা ছিলেন)। আরও ছিলেন নীলিমা, অনুপম, খুকু আহমেদ (মেজর আখতার সাহেবের স্ত্রী)। তারপর ছিলেন রেশমা, মিনু আসমা।"[৪৯] এছাড়া দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে মুক্তিযোদ্ধারা জুন, জুলাইতে কাজ শুরু করেন। সেখানে নানান বয়সী নারীরা একত্রিত হন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা এবং যুদ্ধকে সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষিত অনেক নারী ডাক্তার আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতেন। দেশকে শত্রুমুক্ত করাই তাদের সবার একমাত্র উদ্দেশ্য।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী নির্যাতনের চিত্র

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে ধর্ষণকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল। পাকিস্তানিরা এইযুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ মনে করত। তারা এদেশীয় নারীদেরকে দুইভাবে ধর্ষণ করেছে। ১. উপস্থিত ধর্ষণ ও ২. যৌনদাসী। রাজাকার ও পাকিস্তানি আর্মিরা যেকোন শহর বা গ্রাম আক্রমণের সময় সেখানে লুটপাট করত এবং সেখানকার নারীদেরকে ধর্ষণ করত। কোন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা রাস্তা থেকে নারীদের ধরে এনে ধর্ষণ করত। কোন নারী যখন গ্রেফতার বা নিখোঁজ লোকজনের খোঁজ করতে আর্মি, বিহারীদের সাহায্য চাইতেন তারা তখন তাকে ধর্ষণ করত। যারা উপস্থিত ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন, তারা যৌনদাসী হননি। একাত্তরের মোট নির্যাতিত নারীর ৭০ ভাগ উপস্থিত ধর্ষণের শিকার হন। ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটির হিসাব মতে, উপস্থিত ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা ৩,২৭,৬০০ জন, এদের প্রায় ৩০ ভাগ অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। প্রতিদিন ৩০০০ পাকিস্তানি সৈন্য এবং ৬০০০ বিহারী ও দালাল ধর্ষণ কাজে লিপ্ত ছিল।

যৌনদাসী পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন নারীদেরকে বন্দি রেখে ধর্ষণ করা হতো। আর্মিরা তাদের ক্যাম্পগুলোতে এসব নারীদেরকে বন্দি রেখে দিনের পর দিন গণধর্ষণ করত। ওয়ার ক্রাইম ফ্যাক্টস ফাইণ্ডিং কমিটির হিসাব মতে, ১,৪০,৪০০ জন নারীকে পাকিস্তান আর্মি ও রাজাকাররা নির্যাতন করেছিলেন। তাদের ৮০ ভাগ নারীই গর্ভধারণ করেছিলেন। এছাড়া প্রায় সাতশ নারীকে অপহরণ করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ কমিটির বিবরণ সূত্রে জানা যায় যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনী, বিহারী ও দালাল কর্তৃক সংঘটিত নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার চিত্র ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ।[৫০] ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে অস্ট্রেলিয়ান ডা. জিওফ্রে ডেভিস যুদ্ধে নিপীড়িত এসব নারীদের চিকিৎসা সেবা দিতে এসেছিলেন। তার মতে- গর্ভধারণ করেছিলেন ২ লক্ষ নারী এবং ৪ লক্ষ ৩০ হাজার নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এসকল বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় যে একাত্তরে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নারী নির্যাতিত হয়েছিলেন।

পাকিস্তানি বাহিনীর বাংকারে, বন্দিশিবিরে, রাজাকারদের হাতে বন্দি নারীদের উপর নির্যাতনের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের উদ্ধার করা এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য গড়ে ওঠে ‘নারী পুনর্বাসন সংস্থা’। ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংস্থা কাজ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পর নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হয়।[৫১] ১৯৭১ সালে সেসব নারীদের জীবন দুর্বিসহ ও ভয়ঙ্কর ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে সেই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানিদের নির্যাতনে সৃষ্টি হয়েছিল অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান। তারপর শুরু হয় অরাজক পরিস্থিতি। ধর্ষণের শিকার এসব নারীদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে বা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে অধিকাংশ মানুষই এগিয়ে আসেনি। তবে এসব নারীদের সাহায্যের জন্য সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি সংগঠন এগিয়ে আসে। এক বছরের মধ্যে সংসার পরিত্যক্ত পাঁচ হাজার মেয়ের ঠিকানা হয় ঢাকার ২০ নম্বর ইস্কাটনে। যেখানে বর্তমানে 'নারী পুনর্বাসন সংস্থা' স্থাপিত হয়েছে। এসব সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ নির্যাতিত নারীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

ধষর্ণের শিকার এসকল নারীদের অনেকেই পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরে আনার জন্য সংগঠকেরা অক্লান্ত কাজ করতে থাকেন। তারা নির্যাতিত এ নারীদের কাহিনি লিপিবদ্ধ করেন। তখন সংগঠকেরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ করে যেসকল শিশু যুদ্ধকালীন জন্মেছিল, তাদের অনেককে সন্তানহীন দম্পতিদের কাছে অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। গর্ভপাত করা গিয়েছিল অল্প কয়েকজন নারীর,আর জন্মেছিল অসংখ্যা যুদ্ধশিশু। নির্যাতিত নারীদের সহায়তার জন্য যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার পরিচালক ছিলেন মালেকা খান। এছাড়া বদরুন্নেসা আহমেদ, ড.হালিমা খাতুন, মেহের কবীর, বাসনা হাজারী, শিল্পী সুফিয়া শহীদ ও বেগম শামসুন্নাহারসহ অনেকে নির্যাতিত এ সকল মহিলাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বাঁচার আশা জুগিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে সুফিয়া কামাল তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "গর্ভপাত করা গিয়েছিল কিছুসংখ্যকের, বহু নারীকে জন্ম দিতে হয়েছে যুদ্ধশিশু।"[৫২] মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার নারীদের জন্য দুটি আইন তৈরি করা হয়েছিল-

১. ধর্ষিতার জন্য গর্ভপাত আইন

২. যুদ্ধশিশুদের জন্য আন্তদেশ শিশু দশক আইন।

মাদার তেরেসার কাছে দেয়া হয়েছিল অসংখ্য যুদ্ধ শিশুকে। স্বাধীন বাংলার সরকারের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল 'নারী পুনবার্সন কেন্দ্র'। এর সংগঠক ছিলেন- নীলিমা ইব্রাহিম, সাজেদা চৌধুরী, মোশফেকা মাহমুদ প্রমুখ। এর মূল দায়িত্বে ছিলেন জাস্টিস কে এম সোবহান। এছাড়াও যেসকল নারীরা মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবিক বিপর্যয়ের স্বীকার হয়েছিলেন, তাদের প্রত্যেককে বাংলাদেশ সরকার দুই হাজার টাকা নগদ অনুদান দিয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীতে পুরুষের মতো নারীকে মূল্যায়ন করা হয়নি কিংবা ইতিহাসে তুলে ধরা হয়নি বা তাদের অবদানের বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা করা হয়নি। শুধু মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিত ও নির্যাতিত নারীদের কথাই নানাভাবে মহিয়ান করে তোলা হয়েছে। নারীদেরকে মূলধারার না আনার একটা কারণ আছে। সেটি হচ্ছে- নিম্নবৃত্ত পরিবারের নারীরাই ব্যাপকভাবে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু উচ্চবৃত্ত পরিবারের নারীরা মুক্তিযুদ্ধে কম অংশগ্রহণ করেছিলেন, এজন্য হয়তো নিম্নবৃত্ত পরিবারের সদস্যদের সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে তৎকালীন সমাজ ততটা উদার ছিল না। তবে স্বাধীনতার তিন দশক পরে এই নিম্নবর্গীয় নারীদের কথা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ উভয়ই অত্যাচারিত হয়েছেন, কিন্তু পুরুষের তুলনায় নারীরা বৈষম্যমূলক সম্মান ও পদবী পেয়েছেন। যেমন- পুরুষ হয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা, নারী হয়েছেন 'বীরাঙ্গনা'। পুরুষ পেয়েছেন মর্যাদা, নারী পেয়েছেন অস্বীকৃতি। "বীর প্রতীক" তারামন বিবিকে একজন গবেষকের গবেষণার ফলে ১৯৯৫ সালে খুঁজে পাওয়া গেছে। যুদ্ধ করেছেন বহু নারী। অথচ নারীকে সেই তুলনায় বীরের সম্মান দেয়া হয়নি। অথচ লাখো-কোটি পুরুষ পেয়েছেন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বীরের সম্মান।[৫৩] মুক্তিযুদ্ধের সময় নারীরা সকল রকমের ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নির্যাতিত হয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তা করেছেন, আহতদের সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। অথচ এসকল কাজ মুক্তিযুদ্ধের কাজ বলে আজও মূল্যায়ন পায়নি। ঐতিহাসিকভাবে জাতিসত্তার পরিচয়ের স্বীকৃতি ও নারী সত্তার পরিচয়গত স্বীকৃতিই হচ্ছে (National Identity and Gender Identity) পরস্পরের সাথে যুক্ত। উভয় পরিচয়ই কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। জাতীয় সংকটের সময় কেন্দ্রীয় বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় নারী। এই সময় জাতির দর্শন ও মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতি যখন সংকটের মোকাবিলা করে, নারী তখন দুর্ভোগের শিকার হয়। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ও নারীসমাজ এ ধরণেরই সংকটের মোকাবেলা করেছেন।[৫৪] মুক্তিযুদ্ধ নারীকে করেছে সাহসী, মানবীয়, আত্মনির্ভরশীল, যোদ্ধা। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি নারীকে করেছে অদম্য। পুরুষের পাশাপাশি নারীরা তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে পেরেছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারীর অবদান অন্য রকমভাবে লেখা হত, যদি মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে বা যুদ্ধকালীন সময়েও নারীকে যথেষ্ট প্রশিক্ষিত করে তোলা হতো। কেননা তাহলে প্রশিক্ষিত নারী যোদ্ধারা পাকিস্তানি শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে পারত। তাদেরকে যদি দক্ষ, প্রশিক্ষত, অপ্রতিরোধ্য ও দৃঢ়চেতা হিসেবে গড়ে তোলা হতো তাহলে মানবিকতার এত বিপর্যয় দেখতে হতো

Dhaka University Institutional Repository

না। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালে জেনেভা কনভেনশনের আইন মানার নির্দেশ থাকে। কিন্তু ১৯৭১ সালে নারীদের প্রতি জেনেভা কনভেনশনের আইনের সামান্যতম সম্মান দেখানো হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্রে সাধারণত পুরুষের বিষয়ে, 'তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে রণাঙ্গনে ছিল'-একথাই বহুল উল্লেখিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে লিপিবদ্ধ বহু ব্যক্তির, নীতিনির্ধারক ও প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাক্ষাতকার থেকে সে সময়কার বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে নারী সমাজের সাহসী ভূমিকার কথাও লেখা আছে। কিন্তু অস্ত্র হাতে 'নারী'র সাহসী যোদ্ধারূপ, এদের কারোর চোখে পড়েনি। তবে ব্যতিক্রম ও আছে।[৫৫] এ সম্পর্কে সুফিয়া কামাল বলেন, "কত মায়ের, ভাইয়ের, বোনের অন্তর ছেঁড়া ধন দিয়ে বাংলাদেশ হয়েছে। এই যুদ্ধে মায়ের দান কতটুকু। যে মার তার সন্তানকে ছেঁড়ে দেয়, সে মা জানেন তাঁর সন্তান ফিরে নাও আসতে পারে। আপনারা জানেন, যুদ্ধের সময় ঢাকা শহর খালি হয়ে গিয়েছিল। পাকিস্তানী বাহিনী মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে। তখন সেরকম কোন লোক ছিল না, যাঁরা পাকিস্তানের সৈন্যদের হাত থেকে মেয়েদের রক্ষা করবেন। মেয়েরা তাদের ভাইদের রক্ত দিয়েছেন এবং নিজের ইজ্জত দিয়েছেন। এই কথাটা আপনারা সব সময় স্মরণ রাখবেন।"[৫৬]

সরকারি প্রচেষ্টা এবং রাজনৈতিকভাবে পুরুষ, তরুণ ও যুবকদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। পুরুষদের গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নারীদের জন্য সেরকম কিছুই করা হয়নি। তাদেরকে আত্মরক্ষার কোন কৌশলও শেখানো হয়নি। নারীরা নিজেদের তাগিদে যুদ্ধ করেছেন। কেউ বা পাকিস্তানি সৈন্যদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য যুদ্ধে নেমেছিলেন। সরকার তাদের ব্যাপারে চিন্তা করেনি। এই বাংলায় নিজেদের প্রচেষ্টায় মা-বোনেরা যুদ্ধ করেছেন। ১৯৯০ সালের পর থেকে নারীদের মুক্তিযুদ্ধ করার অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তখন থেকে তাদেরকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, সংবর্ধনা দেয়া হচ্ছে, বই বের হচ্ছে। সাধারণ মানুষ মনে করে মুক্তিযুদ্ধ শুধু পুরুষেরা করেছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এমন ধারণা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদান অস্বীকার করার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে কর্ণেল মোহামামদ শফিকউল্লাহ মন্তব্য করেন যে, নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আজ আত্ম-বিশ্লেষণ করার সময় এসেছে, কিসের জন্য তারা লড়েছিলেন। কেন তারা মুক্তিযুদ্ধকালে ঘর-সংসার ছেড়ে যুদ্ধে গিয়েছিলেন? এবং কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন? সর্বোপরি বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কিভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করেছেন ও নিরাপত্তার ভার নিয়েছিলেন।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

এখানে বিশেষভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসংখ্য নারী যুদ্ধ করলেও মাত্র ৩০২জন নারীকে মুক্তিযোদ্ধার খেতাব দেয়া হয়েছে। স্বাধীনতার বহু পরে তারামন বিবিকে ১৯৯৫ সালে সাংবাদিক অধ্যাপক বিমলকান্তি দে তাঁর অনুসন্ধানগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খুঁজে বের করেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি 'বীরপ্রতীক' পদকপ্রাপ্ত হয়েছেন, অথচ ২৩ বছর ধরে অজ্ঞাত রয়ে যান তারামন বিবি। সিতারা বেগমকেও 'বীরপ্রতীক' প্রদান করা হয়েছে। দীর্ঘ গবেষণা, অনুসন্ধানের পর বিস্মৃতি ও অবহেলার পর ইতিহাস পরিবর্তন হচ্ছে। নারীরা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরোক্ষ নন বরং প্রত্যক্ষ হিসেবে উজ্জ্বল। যেসব নারী মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন, তাদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের মূল্যায়ন করা একান্ত জরুরি বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ২৫ মার্চ রাতে এদেশের নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাক হানাদার বাহিনী পৈশাচিক আক্রমণ চালায়। তখন থেকেই বাঙ্গালীরা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। পিলখানা ও রাজারবাগে পাক-বাহিনী শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতের পর পাক-সেনারা বঙ্গবন্ধুকে তার বাসা থেকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে (২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধ। বাংলার আপামর জনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বাঙ্গালী নারীরা তখন চুপ করে বসে থাকেন নি। তাঁরাও পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধে অংশ নেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদ, আওয়ামী লীগ মহিলা শাখাসহ বিভিন্ন সংগঠনের অধীনে নারীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যুদ্ধের উপযোগী করে তোলে। সারা বাংলায় নারী সংগঠনের দায়িত্বে নিযোজিত ছিলেন মনোয়ারা বসু, উমরতুল ফজল, হেনাদাস সহ অনেকে। এসব নারীরা জেলায় জেলায় ঝটিকা সফর করেছেন। মুজিব নগর সরকারকে নারী নেত্রীবৃন্দরা সমর্থন করেন। নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নানা রকম তথ্য দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধে তহবিল সংগ্রহ করে, খাদ্য সরবরাহ করে, সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান করেছেন। নারীরা ফাস্ট এইড নিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। ত্রাণবিতরণ ও শরণার্থী নারীদের প্রশিক্ষিত করে তোলার দায়িত্বে ছিলেন বদরুননেসা আহমেদ। নূরজাহান মুর্শিদ ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য পার্লামেন্টে বক্তব্য দেয়ায় পাকিস্তান সরকার তাঁকে ১৪ বছরের জেল দেয়। সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ভারতের পদ্মপুকুরে ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি প্রদান করেন ও আমেরিকায় পাকিস্তান দূতাবাসে বিক্ষোভ করেন। নিলীমা ইব্রাহিম, সাজেদা চৌধুরি মাশফেকা মাহমুদ মানবিক বিপর্যয়ের স্বীকার ধর্ষিত নারীদের পুনবার্সনের কাজ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। অর্থাৎ বাংলার নারীরা দেশে বিদেশে যে যেভাবে পেরেছেন, সেভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। গেরিলা যুদ্ধেও নারীদের সরব উপস্থিতি ছিল। শত বাঁধা-বিপত্তি ও নির্যাতনের পরও নারীরা পিছুপা হতে রাজী ছিলেন না। তাদের সবার লক্ষ্য ছিল- বিজয় না আসা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, এতে তারা হয় বাঁচবে নয় মরবে। অবশেষে তাদের স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর বাংলার আকাশ, মাটি মুক্ত হয়েছে পাক-হানাদের বাহিনীর কবল থেকে। আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। অতএব, মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালী নারীর অবদান মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলা যায় যে- কি যুদ্ধ, কি সেবা, কি সংবাদ বহন, কি মাইন বুকে নিয়ে শত্রু সেনাকে আক্রমণ, কি গেরিরা কৌশল অবলম্বন- সকল ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী নারীরা পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪০

২. রেহমান সোবহান, *সাক্ষাৎকার*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮৬

৩. আতিউর রহমান, *অসহযোগের দিনগুলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১৩

৪. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩

৫. মুনতাসীর মামুন, *সেই সব দিন*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮

৬. *সংগ্রামী নারী যুগে যুগে*, ১ম ও ২য় খণ্ড, বাংলাদেশের নারী প্রগতি সংঘ, ঢাকা, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯, পৃ. ১১৯

৭. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৭১, (উদ্ধৃত, সুকুমার বিশ্বাস, মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৮-৭১)

৮. মালেকা বেগম কর্তৃক উনসত্তর ও সত্তর সালের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গৃহীত সাক্ষাতকার ও সেই সব সমাবেশ পরিচালনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত বিবরণ।

৯. মালেকা বেগম কর্তৃক উনসত্তর ও সত্তর সালের গণআন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গৃহীত সাক্ষাতকার ও সেই সব সমাবেশ পরিচালনার নিজস্ব অভিজ্ঞতা সম্পৃক্ত বিবরণ।

১০. সাংবাদিক বেবী মওদুদ লেখক মালেকা বেগমকে বলেছেন সাক্ষাতকার (সূত্রঃ মালেক বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী, পৃ. ৪৪)

১১. মালেকা বেগম কর্তৃক গৃহীত *সাক্ষাৎকার* (সূত্র : মালেকা বেগম, মুক্তিযুদ্ধে নারী, পৃ. ৪৫)

১২. জহিরুল ইসলাম, *একাত্তরের গেরিলা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২০

১৩. মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, চট্রগ্রাম, পৃ. ২৩২

১৪. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩২

১৫. *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ২৪ মার্চ, ১৯১৭ (উদ্ধৃত; সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯৪)

১৬. ফোরকান বেগম, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৪

১৭. জাহানারা ইমাম, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৫

১৮. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৪৯

১৯. রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

২০. সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

২১. আমির-উল-ইসলাম, "মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর", উদ্ধৃত, রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৬৫

২২. জাহানারা ইমাম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৬৮

২৩. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৫৫

২৪. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুপ্ত*, ১৯৯৯, পৃ. ২৭৭

২৫. *মুক্তিযোদ্ধা নারীদের সংবর্ধনা ও লোকসঙ্গীত উৎসব প্রতিবেদন*, ঢাকা বাংলাদেশ নারীপ্রগতি সংঘ, ১৯৯৮, পৃ. ১৬

২৬. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলীলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৩৯-৪০

২৭. মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী*, আহমদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ২০০৩, পৃ.১৬

২৮. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৬

২৯. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১১২

৩০. মাহবুবুর রহমান, *প্রাগুপ্ত*, পৃ . ২৭৮

৩১. হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *স্বাধীনতা সংগ্রাম: ঢাকায় গেরিলা অপারেশন*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৭২-৭৪

৩২. মঈদুল হাসান, সুকুমার বিশ্বাস ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে কসবা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৫-৩৬

৩৩. হারুন হাবিব, *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*, নওরোজ বিস্তাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৮২

৩৪. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩০

৩৫. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলীলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৯৭-১৯৮

৩৬. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫৬,

৩৭. ফরিদা আখতার (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫৬

৩৮. নুরুন্নাহার ফয়জুন্নেসা (সম্পাদিত), *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪১-৬৪

৩৯. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৪৭-১৪৮

৪০. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৬৯-৭০

৪১. আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসি বাঙ্গালি*, *বাংলাদেশ* ১৯৭১, এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন, ১৯৯১, পৃ. ৩৬

৪২. আবদুল মতিন, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৩৬

৪৩. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৪৪. আফসার চৌধুরী (সম্পাদিত), *"বাংলাদেশ ১৯৭১"* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬৩০

৪৫. প্রণবকুমার বড়ুয়া, *মুক্তিযুদ্ধে বাঙ্গালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

৪৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১২৯

৪৭. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১২৯

৪৮. বেগম মুশতারী শফী, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২৩

৪৯. মঈদুল হাসান, সুকুমার বিশ্বাস ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২০৯

৫০. *দ্য নিউইয়ার্ক টাইমস* ২৩ জুলাই, ১৯৭২

৫১. সুমনা শারমীন ও মুন্নি সাহা, 'ধর্ষিতা বোনের শাড়ি, ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা', *সাপ্তাহিক কাগজ পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১১-১৭

৫২. *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১১-১৭

৫৩. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৫২

৫৪. Ayesha Banu, Mere pawns or growing power? Construction of National Identity in gender identity in Bangladesh, London, Sussex University, 1994

৫৫. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৭২

৫৬. মালেকা বেগম, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ২২-২৩

৫৭. মোহাম্মদ শফিকউল্লাহ, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপরিউক্ত অধ্যায়গুলোর আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলার নারীসমাজ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তবে এসব আন্দোলন-সংগ্রামে যোগদান, বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলা, নারী জাগরণে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলার নারীরা হঠাৎ করে অংশগ্রহণ করেননি। এর একটা দীর্ঘ পটভূমি রয়েছে। বাংলার নারী জাগরণে যে বিষয়গুলো প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল নারীদের শিক্ষার সুযোগ। এই শিক্ষার সুযোগই নারীকে ক্রমান্বয়ে সচেতন ও অধিকারবোধসম্পন্ন করে তোলে। বাংলার নারীকে সর্বপ্রথম এই শিক্ষার পথ যিনি দেখিয়েছিলেন, তিনি হলেন মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া। তাঁর অনবদ্য প্রচেষ্টা ও একাগ্রতার কারণেই বাঙ্গালী নারীর শিক্ষার সুযোগ ধীরে ধীরে অবারিত হয়। তখন থেকেই সমাজে নারী-পুরুষের একত্রে পথ চলা শুরু হয়। এরপর থেকে নারীরা ক্রমে ঘরের বাহিরে আসতে শিখেন। বাইরের জগতকে জানার সুযোগ পান। যদিও এই পর্যায়ে খুব কম সংখ্যক মুসলিম নারী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তখন নানা ধরণের পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তখন পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত ছিল। পাকিস্তান পর্বেই বাংলার নারী সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সূচনা ঘটে। এসময় নারীদের জন্য সরকারিভাবে আপওয়া নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তবে বাংলার সচেতন নারী সমাজ বেসরকারিভাবেও বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র বদলে যায়। হিন্দু পরিবারগুলো ভারতে চলে যাওয়ায় স্কুল, কলেজগুলোতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কমে যায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়। এসময় সিলেটের নারী অধ্যক্ষ গভর্নরের সাথে দেখা করে তাঁর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বাড়ানোর অঙ্গিকার করে আসেন। তিনি পরবর্তীতে তাঁর প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী বাড়াতে সক্ষম হন। তবে তখন শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ খুব একটা দৃশ্যমান ছিল না। 'বেগম পত্রিকা' ও 'বেগম ক্লাব' শিল্প-সংস্কতির বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। নারী জাগরণে, সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে, মত প্রকাশে, শিক্ষা ও সমাজ সেবায় *বেগম* পত্রিকা ভূষয়ী প্রশংসার দাবিদার।

Dhaka University Institutional Repository

দেশ বিভক্তির পর ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভাষা বিষয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা নিয়ে প্রথমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু হলেও পরে সেটি রাজনৈতিক রুপ পরিগ্রহ করে। পাকিস্তান সরকার এদেশের মানুষের মতামত জরিপ বা বিশ্লেষণ না করে উর্দুকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চাইলে সর্বমহলে অসন্তোষ শুরু হয়। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি সংগঠন তখন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। এরপর ধীরে ধীরে ভাষা আন্দোলনের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থাকায় ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-ছাত্রীরা ১৪৪ ধারা সফলভাবে ভঙ্গ করতে সক্ষম হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সময় ছাত্রীদের কয়েকটি গ্রুপও একত্রে কাজ করে। এসময় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙ্গার মূল কাজ করেন- রওশন আরা বাচ্চু ও কয়েকজন নারী। এছাড়াও সারা তৈফুরা, সুফিয়া আহমেদ, শামসুন নাহার মাহমুদ, লায়লা সামাদ, শাফিয়া খাতুনসহ ইডেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও এতে অংশ নেন। পুলিশের লাঠিচার্জে তখন ৮ জন ছাত্রী ও নারী নেত্রী আহত হন।

ভাষা আন্দোলনকে সফল করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ছাত্রীরা রাতের আঁধারে পোস্টার লাগিয়েছেন, মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীরা আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। আন্দোলনের অর্থ জোগানোর জন্য নারীরা অলঙ্কার খুলে দিয়েছেন। অনেক নারীকে জেল খাটতে হয়েছে। কেউ সংসার হারিয়েছেন, অনেককে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তবে ভাষা আন্দোলনের সফলতা থেকে নারীর একটি রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী হয়েছে। এর ফলস্বরূপ পরবর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণের মাত্রা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে ভাটা পড়ে। তবে তারা থেমে থাকার পাত্র নন। তাই মুসলিম লীগের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে রোধ করা জন্য ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ব বাংলার বেশ কয়েকটি দল নিয়ে 'যুক্তফ্রন্ট' নামে রাজনৈতিক জোট গঠন করা হয়। মাওলানা ভাসানী, শেরেবাংলা এ.কে.ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুক্তফ্রন্টের নেতা। নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া, জমিদারী প্রথার বিলোপসহ ২১টি দফা ম্যানুফেস্টো প্রকাশ করা হয়। নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৯টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে সক্রিয় করার জন্য ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নারী প্রার্থী নূরজাহান মোর্শেদ, দৌলতুননেসা, রাজিয়া বানু প্রাদেশিক সরকারের পার্লামেন্টরি সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এর মাধ্যমে নারীরা রাজনৈতিক অগ্রায়ণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেন।

এরপর ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীদের সুবিধার্থে অনেকগুলো আইন সংযোজন করা হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল-মোহরানা পরিশোধ, তালাকের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৬ ও ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ নির্ধারণ করা। এরপর ১৯৬২ সালে আইয়ুব সরকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার জন্য কিছু নীতি প্রণয়ন করেন। এতে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি ও উচ্চশিক্ষা সংকোচন করা, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের আসন সংখ্যা কমানো, শিক্ষার্থীদের বেতন বৃদ্ধি, স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের কঠোর পরিশ্রম করানো জন্য ১৫ কর্মঘন্টা নির্ধারণ করা হয়। এটি ছিল মূলত সাধারণ পরিবারের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা বন্ধের একটি ষড়যন্ত্র। এর জন্য শরিফ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিটির রিপোর্টটি প্রকাশিত হলে ছাত্র-ছাত্রীসহ সাধারণ জনগণের মধ্যে অসন্তোষের ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা ছিল এ আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে সরকারের পক্ষ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বরে (১৯৬২ সালে) ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের সংঘর্ষ হয় এবং তাতে ৩ জন ছাত্র মারা যায়। উল্লেখ্য যে, ১৭ সেপ্টেম্বর কয়েকজন ছাত্রীও আহত হন। তাদের প্রতিবাদের মুখে কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়ন বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্দোলন ছিল ইতিহাসের বাঁক পরিবর্তনকারী ঘটনা। এই আন্দোলনের পর ১৯৭১ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা আর কখনো নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেনি।

রাজনীতিতে নারীরা সোচ্চার হওয়ার ফলে ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদে ৬টি ও প্রত্যেক প্রদেশ থেকে ৬ টি আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত করা হয়। চাকুরীকালীন পারিবারিক অসুবিধা বিবেচনা করে নারীরা আইয়ুব খানের কাছে স্বামী-স্ত্রী সরকারি চাকুরিজীবী হলে তাদেরকে একই কর্মস্থলে কাজের সুযোগ দেয়া এবং তাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য সি.এস.এস পরীক্ষার সুযোগ করে দেয়ার দাবি জানান। এসময় 'পূর্ব-পাকিস্তান বিজনেস এন্ড প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৬৪ সালে নারীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলের নামকরণ 'রোকেয়া হল' করা হয়। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে প্রতিহত করার জন্য সম্মিলিত বিরোধী দল

Dhaka University Institutional Repository

'কপ' (COP-Combined Oppoisition Party) এর পক্ষ থেকে ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়। এতে সমগ্র দেশের নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনায় বিকাশ ও সচেতনতাবোধ তৈরি হয়। নারীরা তখন রাজনৈতিক যেকোন বিষয়ে অংশগ্রহণের অধিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি এবং স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রনীত ছয়দফা দাবির প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণ যে সমর্থন দেন, নারীরাও সেটির পক্ষে তাদের পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন।

১৯৬৭ সালে সুফিয়া কামাল সোভিয়েত ইউনিয়নের নারী সংগঠনের আমন্ত্রণে রাশিয়া গমন করেন। তিনি সরকারি সফরে প্রথম সোভিয়েত ইউনিয়নে গমন করা প্রথম বাঙ্গালী নারী। ১৯৬৯ সালে আইয়ুর খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে যে গণ-আন্দোলন শুরু হয় তা ইতিহাসে গণ-অভ্যুত্থান নামে পরিচিত। তখন সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে তাঁর বাসায় নারী নেত্রীবৃন্দ বেশ কয়েকটি সভা করেন। এছাড়াও গণ-অভ্যুত্থানের উত্তাল দিনগুলোতে নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন মিছিল ও সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন।

এরপর ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে ৮৮টি এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৬৭টি আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়ী হলেও পাকিস্তান সরকার তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নারীদের জন্য ৭টি সংরক্ষিত আসন ছিল। এ আসনগুলোতে নির্বাচিত হয়েছিলেন- বদরুন্নেছা আহমেদ, নূরজাহান মুরশিদ, তাসলিমা আবেদ, রাজিয়া বানু, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, রাফিয়া আক্তার ডলি ও মমতাজ বেগম। উল্লেখ যে, ১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল সুফিয়া কামালের নেতৃতে 'পূর্ব-পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' গঠন করা হয়েছিল। বাংলার নারীরা তখন বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন।

নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে মার্চ মাস (১৯৭১) থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ১৮ মিনিটের একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এখানে তিনি বাঙ্গালীকে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। এই ভাষণের সময় ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংখ্যক ছাত্রীসহ নানা শ্রেণী-পেশার অসংখ্য নারীরা অংশগ্রহণ করেন। এ ভাষণের পর নারীরা নিজেদের উদ্যোগে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। নারীদের সংগঠিত করে আশু মুক্তিযুদ্ধের জন্য ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতার লক্ষ্যে নারীদের সচেতন করার জন্য ৯ মার্চ চট্টগ্রামের জে. এস. সেন হলে মহিলা আওয়ামী লীগের সভায় মেহেরুননেসা, বেগম নাজনীন, মুছাখান প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা দেন। 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' সারা বাংলাদেশের নারীদের সংগঠিত করার জন্য সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বহু জেলায় এই সংগঠনটির শাখা গড়ে তোলেন। যুদ্ধকালীন বরিশালে মনোরমা বসু, চট্রগ্রামে উমরতুল ফজল, নারায়ণগঞ্জে হেনা দাস, ঈশ্বরদীতে মিসেস জসিম মণ্ডল, কুমিল্লায় সেলিনা বানু, নরসিংদীতে যূথিকা চ্যাটার্জি নারীদেরকে সংগঠিত ও যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা আক্রমণের নির্দেশ দেন। পাকিস্তান বাহিনী নিরীহ জনগণকে রাতের আধাঁরে নির্বিচারে হত্যা করে। ঢাকা শহরের রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ইপিআর সদর দপ্তর ও পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে অগ্রাসন চালানো হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা, পিলখানায় অগ্রাসন চালানো হয়। তখন অসংখ্য নারীকে তুলে নেয় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী। বহু নারীর প্রতি পাশবিক পৈচাশিকতা চালানো হয়, অনেকে হত্যা করা হয়। যা ইতিহাসের একটি জঘন্যতম অধ্যায়। তখন নারী নেত্রীবৃন্দ উদ্ভুত্য পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং যুদ্ধে ব্যপকভাবে অংশগ্রহণ করা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। এরপর তারা পর্যায়ক্রমে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অনেক নারী গেরিলা যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের প্রতি নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। এছাড়া নারী ডাক্তাররা ও নার্সগণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতেন এবং অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিতেন। তারা মূলত সহযোদ্ধা, বার্তাবাহক ও সেবিকা প্রভৃতি উপায়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন।

এছাড়া দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য নারীরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। 'মহিলা পুনর্বাসন' সংস্থাটি সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বদরুননেসা আহমদ মুজিব নগর সরকারের পক্ষে মহিলদের পুর্নবাসন, মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও শরণার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। ভ্রাম্যমান রাষ্ট্রদূত হিসেবে ভারতের পার্লামেন্টে বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য বক্তব্য দিলে পাকিস্তান সরকার নূরজাহান মুর্শিদকে ১৪ বছরের জেল দেয়। সাজেদা চৌধুরী নারীদের প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের পদ্মপুকুর এলাকায় গোবরা ক্যাম্প পরিচালনা করেন। প্রবাসী বাঙ্গালী নারীরা ইংল্যান্ডে

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেন এবং নেত্রী আশালতা আমেরিকায় প্রবাসীদের সংগঠিত করে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা অনেক নারী বন্দিশিবিরে ও ক্যাম্পে নির্যাতিত হয়েছেন। অনেক অনাকাঙ্খিত সন্তানের জন্ম হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ নারীর সম্ভ্রমহানির প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব নারীরা আমাদের গর্ব ও অহংকারের প্রতীক। নারীরা যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বেশি সহিংসতার স্বীকার হয়েছেন। দেশ স্বাধীন হলে তাদেরকে অসম্মান, অপমানের বোঝা বহন করতে হয়েছে। নির্যাতিত এ সকল সমাজ-সংসার পরিত্যক্ত নারীদের স্থান হয়েছে নারী পুনর্বাসন সংস্থায়। এ অবস্থায় 'ধর্ষিতার গর্ভপাত' ও 'আন্তদেশ শিশু দশক আইন' তৈরি করে বহু সন্তানকে মাদার তেরেসার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের সংগঠক ছিলেন নিলীমা ইব্রাহিম, সাজেদা চৌধুরী, মাশফেকা মাহমুদ প্রমুখ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মাত্র কয়েকজন নারীকে সম্মানীত করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন- সেতারা বেগম, তারামন বিবি, কাঁকন বিবি। তাঁদেরকে 'বীর প্রতীক', 'বীর উত্তম' পদক প্রদান সহ নগদ টাকা, বাড়ি ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া হয়েছে। ধর্ষণের স্বীকার নারীদেরকে 'বীরাঙ্গনার' মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অথচ যে বিপুল সংখ্যক নারী যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাঁদেরকে খুঁজে বের করা হয়নি। ১০ নম্বর সেক্টর ছাড়া সকল সেক্টরে নারীরা যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেইসব নারীদের কথা ইতিহাসে উল্লেখ নেই। তাঁরা বঞ্চিত থেকে গেছেন। সম্মান বা পদকের জন্য হয়তো তাঁরা সেদিন ভাবেননি। মূলত দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করাই ছিল সেদিন তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু পুরুষ মুক্তিযোদ্ধাদের মতো তাদের স্বীকৃতি ও পদক দেয় উচিত ছিল। সরকারের উচিত সকল সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করা।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলায় নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে। নারীদেরকে রাজনীতিতে আরো বেশি সম্পৃক্ত করা এবং ক্ষমতায়ন করার জন্য নানান পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে নারী সদস্যদের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এগুলো নিঃসন্দেহে স্বাধীনতার সুফল। এসকল সুযোগ-সুবিধা পাকিস্তানি আমলে পূর্ব বাংলার নারীরা পাননি। বর্তমানে চাকুরীতে নারী কোটা রাখা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সংসদে ৩০% মহিলা কোটাসহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদে নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য সংরক্ষিত আসন রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, স্পীকার সকল পদে নারী নেতৃত্ব বিদ্যমান আছে।

সর্বশেষ বলব যে, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয়দফা আন্দোলন ও '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালী নারীর রাজনৈতিক প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে বাঙ্গালী নারীরা এসব আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। সর্বোপরি নারী নেত্রীবৃন্দ বাংলার নারীদেরকে অধিকার সচেতন করেছেন, রাজনীতিতে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হয়, তার কৌশল শিখিয়েছেন। নারীর এসকল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায়ই সর্বশেষে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপক সংখ্যক নারী অংশগ্রহণ করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সফলতা নিশ্চিত করেছেন। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে নারীদের পারঙ্গমতা বাংলার ইতিহাসে একটি সোনালী অধ্যায়ের সংযোজন করেছে এবং বাঙ্গালী নারীর সংগ্রামী ঐতিহ্যকে বহুগুণ শাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

আহমেদ ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩

আলী এস. ওয়াজেদ, (*তুর্কি হানুস*) *এস ওয়াজেদ আলীর রচনাবলী*, ঢাকা, ১৯৮৫

আহাদ অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- '৭৫*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৪

আহমেদ আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

আব্দুল কাশেম মোঃ, ''বাঙালি মুসলমানদের ভাষা সচেতনতার দ্বারা (১৯৪০-১৯৭০)", কোরেশী মাহামুদ শাহ সম্পাদিত, *আই.বি.এস জার্নাল ১৪০৩: ৪*, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৪০৩ (বাংলা সন)

আখতারুজ্জামান মোহাম্মদ (সম্পাদক), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রেক্ষাপট ও ঘটনা*, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৯

আজাদ হুমায়ুন, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

আখতার ফরিদা (সম্পাদিত), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, নারীগ্রন্থ, ঢাকা, ১৯৯১

ইব্রাহিম নিলীমা, *আমি বীরাঙ্গনা বলছি*, জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৯৯৫

ইসলাম রফিকুল (সম্পাদিত), *সম্মুখ সমরে বাঙালি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

_____ *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

ইসলাম শামিম, *বেগম রোকেয়া: অর্জনের ইতিহাস*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা

ইয়াসমিন ফরিদা, *ভাষা আন্দোলন ও নারী*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫

ইসলাম জহিরুল, *একাত্তরের গেরিলা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

ইমাম জাহানারা, *একাত্তরের দিনগুলি*, সন্ধানী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

ইউসুফজাই নৌসের আলী খান, *বঙ্গালী মুসলমান*, হিন্দুপ্রেম, কলকাতা, ১২৯৭

এঙ্গোলস কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ, *নির্বাচিত রচনাবলী*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯

ওদুদ কাজী আব্দুল, *বাংলার জাগরণ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৬

কবির মোহাম্মদ হুমায়ুন, *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

কামাল সুফিয়া, *একাত্তরের ডায়রি*, জ্ঞান প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৬

কামাল সুফিয়া, *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১

কামাল মোস্তফা, *ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

কাদির আবদুল (সম্পাদিত), *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

কাশেম আবুল, *একুশের সংকলন কাশেম ' ৮০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০

গুপ্ত সুপর্ণা (সম্পাদিত), *ইতিহাসে নারী : শিক্ষা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

গঙ্গোপাধ্যায় প্রভাতচন্দ্র, *বাংলায় নারী জাগরণ*, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ

———— *ভারতের জাতীয় আন্দোলন*, *কলিকাতা*, ১৯৫৭

ঘোষ বিনয়, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ১৯৬৮

———— *বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৪

চৌধুরী আফসার, *বাংলাদেশ* ১৯৭১, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৭

চক্রবর্তী জতান, *ঢাকা জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৭

চক্রবর্তী রেণু, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কমিউনিউস্ট মেয়েরা*, ১৯৪০-৫০, মণীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮০

জাহাঙ্গীর সেলিম, *সুফিয়া কামাল*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।

ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথ, *ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

———— *একাত্তরের দশমাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

তারেক, রেজা, লি, এম, *একুশ: ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৫৬)*, ঢাকা, ২০০৪

ত্রিবেদী রবীন্দ্রনাথ, *ছয় দফা থেকে বাংলাদেশ*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

———— *একাত্তরের দশমাস*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

তুষার আবদুল্লাহ (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষাকন্যা*, নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ঢাকা, ১৯৯৭

দেশাই আর, *ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি*, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭

দস্তিদার পূর্ণেন্দু, *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, প্রকাশভবন, ঢাকা, ১৩৮৫

দাস হেনা, *স্মৃতিময় দিনগুলো*, চারিদিক প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৮৯

দাশগুপ্ত রনেশ, *রহমানের মা ও অন্যান্য* , জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৪

দাশগুপ্ত কমলা, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী*, জয়শ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

দেলোয়ার আবু মোহাম্মদ, *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

নাগ নিবেদিতা, *পূর্ববাংলার মহিলা সমিতি ও নারী আন্দোলন*, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, কলিকাতা, ১৯৮৭

পুরকায়স্থ নিবেদিতা, *মুক্তি মঞ্চে নারী*, প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯

ফয়জুন্নেসা নুরুন্নাহার (সম্পাদিত), *একাত্তরের প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছদ*, উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, ১৯৮৭

বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

———————— *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

বসু স্বপন, *বাংলার নবচেতনার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৫

বড়ুয়া প্রণবকুমার, *মুক্তিযুদ্ধে বৌদ্ধ বাঙ্গালি সম্প্রদায়*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীতা, *আধুনিকতার অভিমুখে বঙ্গনারী*, অর্পনা বুক ড্রিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৫

বিশ্বাস কৃষ্ণকলি, *স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৮৭

বিশ্বাস সুকুমার, *মুক্তিযুদ্ধে রাইফেলস ও অন্যান্য বাহিনী*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯

বেগম রওশন আরা, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩

বেগম ফোরকান, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, সুমি প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৮

বার্ণিক, এম. এ., *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস : ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ*, এইচ ডেভলপমেন্ট পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ২০০৫

বেগম মালেকা, *ইলা মিত্র*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

———————— *নারীমুক্তি আন্দোলন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

———————— *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ২০১২

———————— *মৃত্যঞ্জয়ী রোকেয়া স্বদেশী ও স্বাদেশিক*, সূচিপত্র, ঢাকা , ২০০৮

———————— *নির্বাচিত বেগম অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র* ১৯৪৭-২০০০, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, ২০০৬

———————— *বাংলার নারী আন্দোলন*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯

———————— *মুক্তিযুদ্ধে নারী* , প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

———————— *পুষ্পকুন্ডলা বিপ্লবী সূর্যসেনের জীবনসঙ্গিনী ও বিপ্লবী নারীদের কথা*, ঢাকা, প্যাপিরাস, ২০০২

মতিন আবদুল, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসি বাঙ্গালি, বাংলাদেশ* ১৯৭১, এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন, ১৯৯১

মুহিত আবুল মাল আব্দুল, *স্মৃতি অম্লান* ১৯৭১, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৬

মামুন মুনতাসীর, *সেই সব দিন*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

মওদুদ বেবী, *বাংলাদেশে নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪

হাসান মঈদুল, সুকুমার বিশ্বাস ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধে কসবা*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯

হক, মোহাম্মদ একরামুল, *রাজশাহী জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

মানিক, আব্দুল হামিদ, *সিলেটে ভাষা আন্দোলনের পটভূমি*, ঢাকা, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

মান্নান কাজী আব্দুল, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৯০

মুরশিদ গোলাম, *নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী*, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১

মুখোপাধ্যায় কনক, *নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা*, কলকাতা, ১৯৯৩

মোরশেদ হেদায়েত হোসাইন, *স্বাধীনতা সংগ্রাম; ঢাকায় গেরিলা অপারেশন*, ঢাকা নগর জাদুঘর, ঢাকা, ১৯৭২

মনজুর নূরুল ইসলাম, *রামমোহন রায় ও তৎকালীন বাংলার সমাজ* , সমতট প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০

মিত্র সুধীর কুমার, *হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ*, মিত্রানী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৬২

মেহেরুল্লাহ মোহাম্মদ, *বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার*, যশোহর, ১৩৭৫

———————— *বাল্যবিবাহের বিষময় ফল*, পাবনা, ১৯০৯

রায় খোকা, *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮

রহমান এস. আবদুর, *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা*, প্রেডিন্সিয়াস বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৭

রায় শান্তিময়, *ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৯

রশিদ হারুন-অর, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

রহমান আতিউর, *আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০০

———————— *অসহযোগের দিনগুলি*, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৮

রহমান হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮২

———————— *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, অষ্টম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৪

———————— *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, পঞ্চদশ খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৫

রহমান মো.মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

শাহ রহীম (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ পঁচিশ বছর*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৭

শফিউল্লাহ মোহাম্মাদ, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলার নারী*, আহমদ পাবলিসিং হাউস, ঢাকা, ২০০৩

শফী বেগম মুশতারী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, প্রিয়ম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

———————— *স্বাধীনতা আমার রক্ত ঝরা দিন*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

সেনগুপ্ত গীতশ্রী বন্দনা, *স্পন্দিত অন্তর্লোক*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯

সেন রংগলাল, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

সেন সত্যেন্দ্র, *মনোরমা বসু*, খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০

সরওয়ার কনক, *নারীর ক্ষমতায়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, জ্ঞানবিতরণী, ঢাকা, ২০০৫

সিদ্দিকী কাদের, *স্বাধীনত '৭১*, বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন আবু মোঃ দেলোয়ার, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ বিষায়ক গ্রন্থপঞ্জী*, মূলধারা, ঢাকা, ১৯৯১

হোসেন আব্দুল, *আদেশের নিগ্রহ*, আশ্বিন, ১৩৩৬

হালিম মুহাম্মদ আব্দুল, *খুলনার ভাষা আন্দোলন-১৯৪৮*, চিত্র প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৯৩

হক আব্দুল, *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬

হক গাজীউল, *আমার দেখা আমার লেখা*, মেরী প্রকাশন, ঢাকা, ২০০০

———————— *একুশের সংকলন ৮০ : স্মৃতিচরণ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হাবিব হারুন, *প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মুক্তিযুদ্ধ*, নওরোজ বিস্তাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৯১

আলহেলাল বশির, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থ

Basu Aparna "The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom", In *Indian Women: From Purdah to Modernity*, B.R. Nanda (ed.), Vikas Publishing, New Delhi, 1976

Banu Ayesha, Mere pawns or growing power? Construction of National Identity in gender identity in Bangladesh, London, Sussex University, 1994

Banerjee Premnath (ed.), *Hundred years of the University of Calcutta*, University of Calcutta, Calcutta, 1957

Taneja Anup, *Gandhi*, *Women, and the National Movement, 1920-47***,** Har-Anand Publications, Delhi, 2005

Gandhi, "Speech at meeting of muslim women", *Collected works of Mahatma Gandhi*, Vol- XX, p. 397

Rashid Harun-or, *Foreshadowing of Bangladesh*: *Bangal Muslim League and Muslim Politics, 1906-1947,* UPL, Dhaka, 2003

Hamid S, Why women count : essays on women in development in Bangladesh, Dhaka University Press Ltd., 1996

Walsh Judith E, *Domesticity in coloncial India*: What women learned When Men Gave them Advice, Oxford University Press, New Delhi, 2004

Ketelbey D, *A History of Modern Times from 1989*, Oxford University Press, London, 932

Muhit, AMA, *State Language Movement in East Bengal 1947-1956,* UPL, Dhaka, 2008

Mukherjee Kanak, *Women Emancipation Movement in India*, National Book Centre, New Delhi, 1989

Mukherjee S.N, ''Raja Rammohonan Roy and the status of women in Bengal in the Nineteenth century", Michale Allen and S.N Mukherjee (ed.), *Women in India and Nepal*, Australian Naitonal University, Canberra, 1982

Dhaka University Institutional Repository

Mathur Y.B, *Women's Education in India, 1813-1966*, Asia Publishing, Bombay, India, 1973

Murdoch j., Twelve Years of Indian Progress, Extracted from the Indian National Congress, the Resolutions of its Thirteen Session, Madras, India, 1889

Shaheed Khawar Mumtaz and Farida (ed.), *Women of Pakistan*, Zed Books Ltd., London, 1987

O'Malley, L.L.S (ed), *Modern India West*, Oxford University press, London, 1968

Papanek H and G.Minault, *Separate Worlds: Studies of purah in South Asia,* Chanakya Publication, Delhi, 1982

Sarkar Sumit, *The Swadeshi Movement in Bengal*, peoples Publishing House, New Delhi, 1977

Syed Nurullah and J.P.Naik, *History of Education in India during in British period*, Bombay, India, 1943

Usha Sharma and B.N Sharma (ed.), *Women Education in Modern India*, Commomwealth publishers, New Delhi, 1995

Webster J E, *East Bengal District Gazetteers*, Tippera, 1919

Wollestonecraft Mary, *Vindication of the Rights of women*, London, 1972

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধ/নিবন্ধ/স্মরণিকা

কামাল, সৈয়দ মোস্তফা, *ভাষা আন্দোলনের সিলেটের অবদান*, সেমিনার স্বরূপ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সিলেট, ২০০৬

মহিউদ্দিন এ.এইচ.এম, '*ফয়জুন্নেছার জীবন আলেখ্য*', রূপজালাল শতবকার্ষিকী স্মরণী, ১৯৭৬, পশ্চিমগাঁও, কুমিল্লা, ১৯৭৭।

————" নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মোতওল্লী আলহাজ্ব ছৈরাজল হক", স্ফুরণ : নওয়াব ফয়জুন্নেছা কলেজ বার্ষিকী, কুমিল্লা, ১৯৭৮-৭৯

মার্কস কার্ল, *ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল* (প্রবন্ধ) নিউইয়র্ক ডেইলি, সংখ্যা ৩৮৪০, ১৮৫৩

মৈত্র, অক্ষয় কুমার, "মুসলমানদের শিক্ষা সমিতি", সাহিত্য *১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩১০ (বাংলা)

চৌধুরী মায়দিয়া গুলরুখ এবং মানস (সম্পাদিত), *কর্তার সংসার*, ঢাকা, রূপান্তর প্রকাশনা, ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা

আল ইসলাম, আশ্বিন, ১৩২৬

ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩

আল ইসলাম, ৫ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩২৬

আল ইসলাম, আশ্বিন, ১৩২৬

আল ইসলাম, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬

আল-ইসলাম, কার্তিক ১৩২৬

দৈনিক আজাদ, ২ খণ্ড, পৃ. ৮৩২

দৈনিক আজাদ, ২২.২. ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ২২.২. ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ২২.২. ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ২৪.২. ১৯৫২

সাপ্তাহিক সৈনিক, ২৭.২. ১৯৫৩

দৈনিক আজাদ, ২৭.২. ১৯৫২

দৈনিক আজাদ, ঢাকা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০ ২৩.২.১৯৫৩

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ১৯৭০

দ্য নিউইয়ার্ক টাইমস ২৩, জুলাই, ১৯৭২

ইসলাম প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩

সপ্তাহিক কাগজ পত্রিকা, ১৯৯২

স্বাধীন বাংলা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

জয়বাংলা, ১ম বর্ষ, ২০ সংখ্যা

নবনূর, তৃতীয় বর্ষ, সংখ্যা-৬, ১৩১২, বঙ্গাব্দ

নবনূর, অগ্রহায়ণ, ১৩১২ বঙ্গাব্দ

দৈনিক পূর্বদেশ, ঢাকা, ৮ মার্চ, ১৯৭১

দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা, ২৪ মার্চ, ১৯১৭

বাংলাদেশ, ১ম পর্ব, ১৫ সংখ্যা, পৃ. ১৪৩

সাপ্তাহিক বেগম, ঢাকা, ২৫ জুলাই ১৯৬৪

সাপ্তহিক বেগম, ১২ অক্টোবর, ১৯৬৩

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ৮ম বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ঢাকা

মাসিক মোহাম্মদী , ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মাসিক মোহাম্মাদী, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫

মোয়াজ্জেন, কার্তিক, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

যুগভেরী, ৩.৪.১৯৮

সাওগাত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৩৬

সাওগাত, ৭মবর্ষ, ৮ম সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৩৬

সাওগাত, জ্যৈষ্ঠ , ১৩২৬

সওগাত, ভাদ্র, ১৩৩৪

সাওগাত, কার্তিক, ১৩৩৪

সাওগাত, মাঘ, ১৩৩৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে চট্রগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব দখলের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ব্যবহৃত ৩৮ বোর রিভালভার।

(বাংলাদেশ পুলিশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে সংগৃহীত)

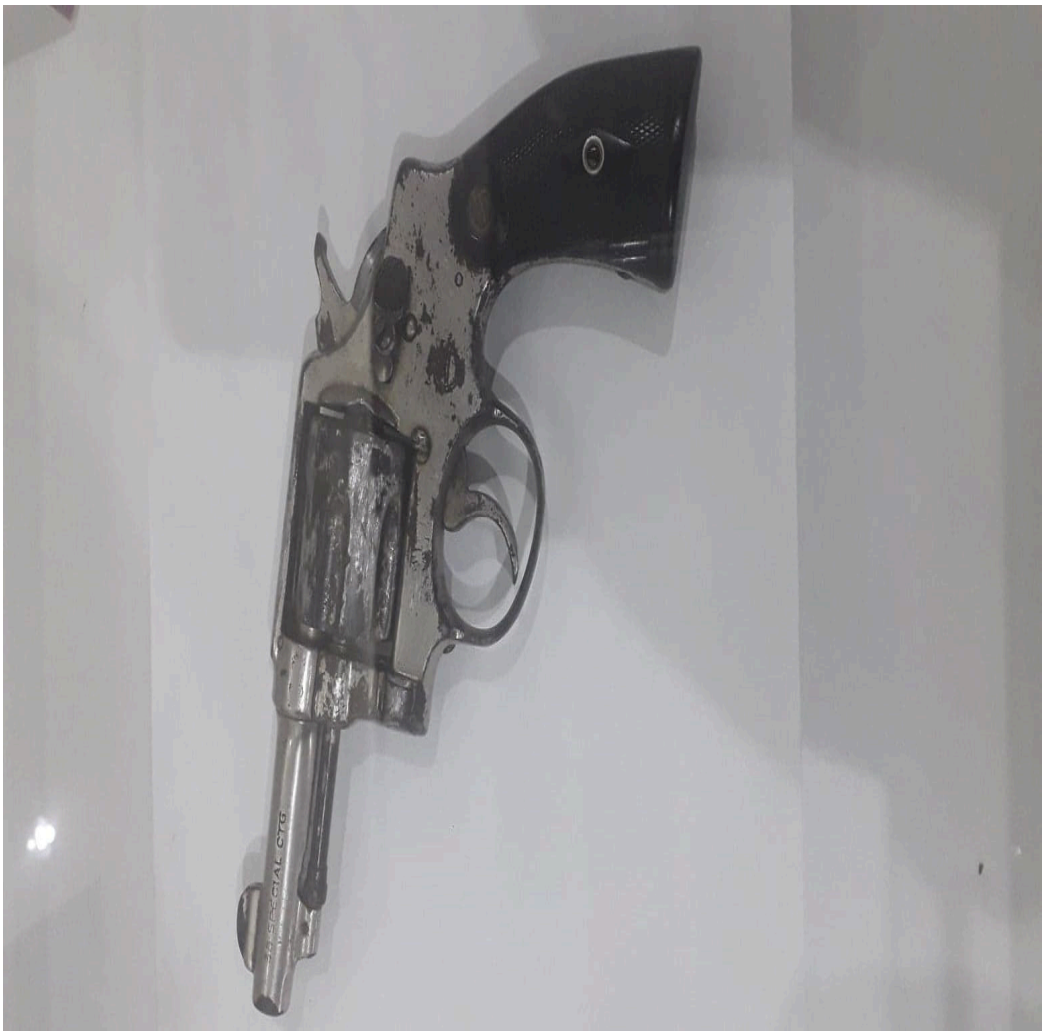

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জমায়েত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ দিবসে ঢাকার নবাবপুর রোডে ছাত্র-ছাত্রীদের শোভাযাত্রা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে পুরানো ঢাকা কলেজ প্রাঙ্গণে ইডেন কলেজের ছাত্রীদের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষের বাধা

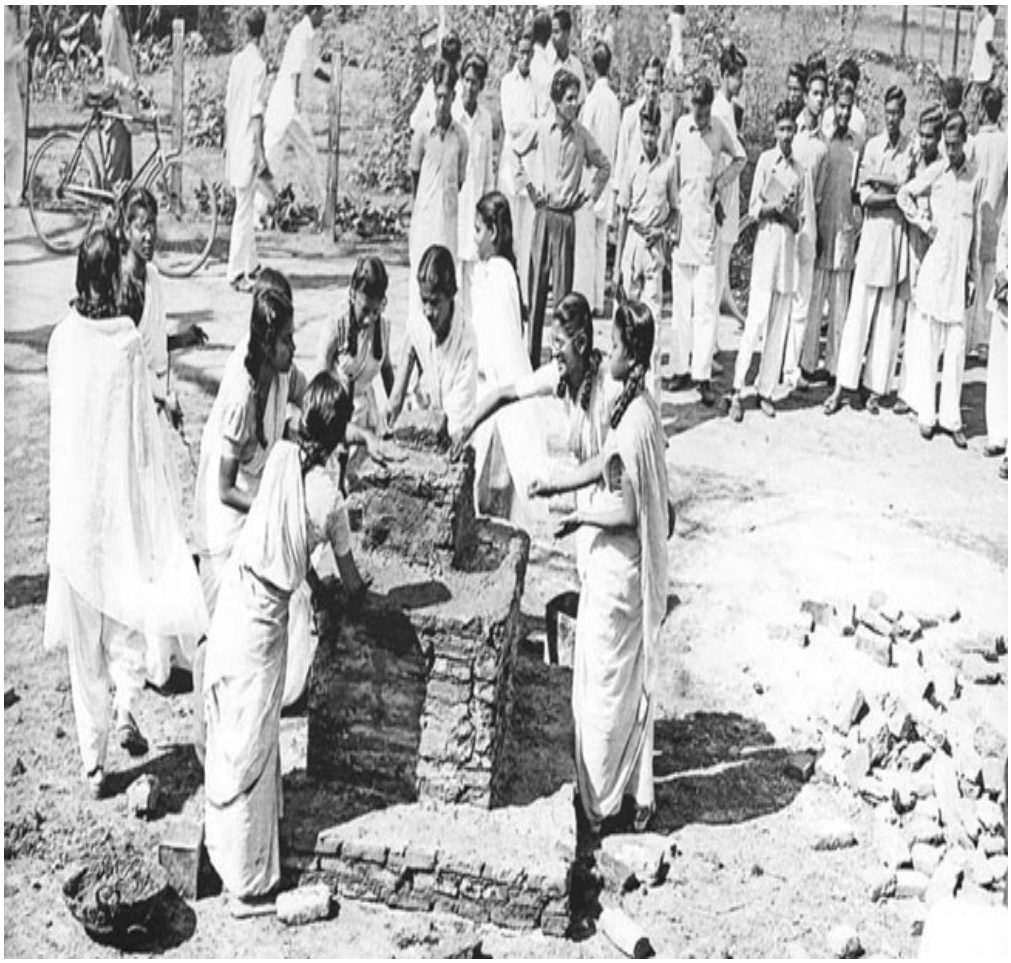

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৬

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নারী সমাজের প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৭

লাহোর প্রস্তাবের কার্যকারী কমিটি

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৮

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর আইয়ুব খানের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে নারী সমাজের প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১১

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রশিক্ষণরত অবস্থায় নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১২

মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রশিক্ষণরত অবস্থায় নারীরা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৩

অস্ত্রহাতে নারী মুক্তিযোদ্ধা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৪

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৫

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের মার্চপাস্টে অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৬

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতে আশ্রয় নিতে যাওয়া নারী-পুরুষ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১৭

ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের খোঁজ-খবর নিচ্ছেন ইন্দ্রিয়া গান্ধী